নানান কথা

– মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

আমাদের নিত্যব্যবহার্য *ছাতা* নামক বস্তুটি মানুষ প্রথম কখন থেকে ব্যবহার করা আরম্ভ করেছিল তার সঠিক তথ্য জানা না গেলেও এ কথা বলা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই কোনো না কোনোভাবে এর ব্যবহার হয়ে আসছে। প্রাচীনকালে মানুষ রোদ, বৃষ্টি ও তুষারপাত থেকে নিজেকে রক্ষার প্রয়োজনে মাথার ওপর একটা চলমান আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল। প্রথম দিকে হয়তো মানুষ গাছের পাতা, ছাল অথবা পশুর চামড়া দিয়ে সে আচ্ছাদন তৈরি করে নিয়েছিল যা কালক্রমে ছাতায় রূপ নিয়েছে। যুগ পেরিয়ে সে ছাতা হয়েছে সুদৃশ্য, সভ্যতার বাহন ও মানুষের নিত্যসঙ্গী।

জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে রাজা বাদশাদের মাথার ওপর ছাতা ধরা হতো। এটা ছিল রাজা–বাদশার মর্যাদার প্রতীক। রাজা–বাদশার মাথার ওপর ছাতা ধরার জন্য একজন নির্দিষ্ট কর্মচারী থাকতো যাকে *ছত্রধর* বলা হতো। দরবারে বসলে অথবা বাইরে গেলে রাজা–বাদশার মাথার ওপর ছাতা ধরে রাখতো ছত্রধর। এ থেকেই মনে হয় রাজার আরেক নাম হয়েছে *ছত্রপতি।*

ছাতা আবিষ্কারের ইতিহাস যাই থাকুক না কেন, কিংবদন্তি আছে যে, কালো কাপড়ের ও বাটওয়ালা ছাতা প্রস্তুত করে প্রস্তুতকারক প্রথম যেদিন মাথায় ধরে বাইরে বের হয়েছিলেন সেদিন রাস্তার পাশের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে দেখেছিল এবং কি এক অদ্ভুত জিনিস ভেবে কেউ কেউ পাথর ছুড়ে মেরেছিল।

এক সময় ছাতা ছিল কালো কাপড়ের ছাউনিযুক্ত ও বেতের বাটওয়ালা। বেতের বাটটির হাতে ধরার প্রান্ত ছিল বাকানো। বেতের বাকানো বাটওয়ালা ছাতা এখন আর দেখাই যায় না। পরিবর্তে এসেছে কাঠ, লোহা ও প্লাস্টিকের বাটওয়ালা সুদৃশ্য আধুনিক ছাতা। ছাতার কাপড়েও এসেছে নানান বাহারি রঙ। হালে আবার ফোল্ডিং ছাতার ব্যবহার প্রচুর বেড়েছে। ফোল্ডিং ছাতা ব্যাগে করে নেয়া যায়। লেডিজ ছাতা মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগেও রাখা যায়। এতে আগের বড় ছাতা ব্যবহারে যে অসুবিধা ছিল তা দূর হয়েছে।

ছাতা নিয়ে এবার কয়েকটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি :

কয়েকদিন আগে সদ্য বিদেশ থেকে আসা এক ভদ্রলোকের কাছে একটি ফ্যানওয়ালা ছাতা দেখলাম। এতে বাটের যে প্রান্ত হাতে ধরে রাখা হয় সে প্রান্তে একটি ব্যাটারি ও একটি সুইচ সংযুক্ত আছে। সুইচ টিপ দেয়া মাত্র ছাতা খুলে গেল এবং কাপড়ের নিচে বাটের সঙ্গে সংযুক্ত ছোট ফ্যানটি ঘুরতে লাগলো। ফলে ছাতা মাথায় দিয়ে ফ্যানের ঠাণ্ডা বাতাসও পাওয়া গেল। ভাবিষ্যতে হয়তো ছাতার সঙ্গে ফোন সংযুক্ত হতে পারে। আমরা সেদিনের অপেক্ষায় আছি।

আমাদের সমাজে বিয়ের ঘটকের টিপিকাল চেহারার সঙ্গে হাতে বা বগলে ছাতা অবশ্যম্ভাবী। একদিন এক বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম বগলে ছাতা, মাথায় টুপি, চিবুকে একটু দাড়ি ও চোখে ঝোলানো চশমা পরা ঘটক ছুটে পালাচ্ছে আর কয়েকটি ছেলে রঙ মাখানোর জন্য তাকে তাড়া করে চলেছে। ঘটকের এ দৌড় দেখে সেদিন বেশ মজা পেয়েছিলাম।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ছাতা ব্যবহারে অভ্যস্ত নই। জীবনে যা দুই একবার ছাতা ব্যবহার করেছি তাও আবার ভুলে ফেলে এসেছি। ছাত্র জীবনে আমরা কয়েকজন এক সঙ্গে স্কুলে যাতায়াত করতাম। আমাদের সঙ্গে মোস্তফা নামে একজন ছাড়া কেউই ছাতা ব্যবহার করতাম না। একদিন স্কুলে থেকে ফেরার পথে বৃষ্টি শুরু হলো। বৃষ্টি দেখে মোস্তফা ছাতা মেলতে যাবে এমন সময় আমরা সবাই তাকে চেপে ধরলাম ছাতা বন্ধ করার জন্য। আমাদের চাপে পড়ে মোস্তফা ছাতা বন্ধ করে দিল।

অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। আমরা সবাই বইপত্র নিয়ে ভিজে হেটে চলেছি। মোস্তফাও ছাতা বন্ধ করে তা বগলে নিয়ে আমাদের সঙ্গে হেটে চলেছে। ছাতা থেকেও আমাদের সঙ্গে এক হয়ে মোস্তাফার ভিজে চলার আনন্দের কথা আজো মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

ছাত্র জীবনে একবার নদীর ঘাটের এক মাঝিকে তার বদমায়েশির জন্য দুই বন্ধু মিলে ছাতাপেটা করেছিলাম। বলা বাহুল্য, হাতের কাছে অন্য কিছু না পাওয়ায় নতুন কেনা ছাতাটিই ব্যবহার করেছিলাম। এতে ছাতাটির বাট গিয়েছিল ভেঙে। সদ্য কেনা নতুন ছাতার বাটটি ভেঙে যাওয়ায় বাড়িতে কি জবাব দেবো ভেবে সেই ছেলে বয়সে যে কি ভয় পেয়েছিলাম তা আজো মনে আছে।

শুনেছি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছেলেবেলায় স্কুলে যাওয়ার সময় ছাতা মাথায় দিয়ে যেতেন। তার ছাতাটি ছিল বেশ বড় অর্থাৎ বড়দের ছাতা। চেহারায় বেটে–খাটো ঈশ্বরচন্দ্রের দেহের তুলনায় বিরাট ছাতা মাথায় দিয়ে যখন হেটে যেতেন তখন দূর থেকে মনে হতো শুধু ছাতাই চলে যাচ্ছে। এ ধরনের ছাতা ব্যবহারের জন্য পথের লোকজন ও সঙ্গী–সাথীরা তাকে প্রায়ই ঠাট্টা–বিদ্রূপ করতো। অবশ্য এসব ঠাট্টা–বিদ্রূপকে ঈশ্বরচন্দ্র কিছুই মনে করতেন না।

একদিন পল্টন ময়দানে এক রাজনৈতিক সভায় গিয়েছিলাম। সভায় প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। দিনটি ছিল মেঘলা। হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল। দেখা গেল, জনসভায় বসা ও দাড়ানো সব লোক এক সঙ্গে ছাতা মেলে ধরেছেন। সারা মাঠে শুধু ছাতা আর ছাতা। স্টেজের পাশে একটু উচু জায়গায় দাড়িয়ে তাকিয়ে দেখলাম সামনে শুধু ঢেউ খেলানো কালো মাঠ। এমন দৃশ্য দেখতে সেদিন বেশ ভালোই লেগেছিল।

ছাতা সম্পর্কে এবার কয়েকটি কুইজ বলে লেখা শেষ করছি।

এক. ছাতা আমরা সকলেই ব্যবহার করি। চটজলদি না গুণে বলুন তো, ছাতার কয়টি শিক থাকে?

দুই. বলুন তো, বাংলাদেশের কোন জেলার কোন উপজেলার লোকদেরকে ছাতা মেরামতের জন্য *ছাতার ইঞ্জিনিয়ার* বলা হয়?

তিন. পথঘাটে ও গ্রামগঞ্জে যেখানেই সবুজ ছাতা দেখা যায় বলনু তো, সেখানে কি পাওয়া যায়?

চার. এক লোক রাস্তায় চলার সময় ছাতা বগলে নিয়ে চলেন। কিন্তু গাছ তলায় গেলে ছাতা মেলে ধরেন। বলুন তো, লোকটি গাছ তলায় ছাতা মেলে ধরেন কেন?

রাজশাহী থেকে

প্রতীক

– শাহানা আক্তার

আমার স্বামী ১৯৯৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফেলোশিপ নিয়ে এক বছরের জন্য ব্যাংককে এমএস করতে গিয়েছিল। স্বামীর বার বার টেলিফোন ও চিঠিতে অনুরোধের প্রেক্ষিতে তার একাকীত্ব ঘোচাতে

মে ২০০০-এ ব্যাংককে গিয়েছিলাম। ছুটির দিনে আমরা বিভিন্ন মার্কেট ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করতাম।

একদিন একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের একটা ফ্লোর ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বিক্রির জন্য থরে থরে সাজানো দেখলাম। একটি রঙিন ২০ ইঞ্চি স্যামসং টেলিভিশন মাত্র ছয় হাজার বাথ যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় সাত হাজার পাচশ হবে। সিদ্ধান্ত নিলাম এতো শস্তা টিভি কিনবো। দেশে ফেরার সপ্তাহ দুই আগে মার্কেটে গিয়ে নয় হাজার বাথ দিয়ে ২২ ইঞ্চি স্যামসং টিভি কিনলাম। মার্কেটের নিয়ম অনুযায়ী টিভি নিয়ে গেট দিয়ে বের হওয়ার সময় দাম পরিশোধ করে নিচে নামলাম। মার্কেটের সামনে থেকে ট্যাকসিতে টিভি উঠানো হলো।

ট্যাকসি চলতে শুরু করেছে এমন সময় মার্কেটের সেলসম্যান ঊর্ধশ্বাসে দৌড়ে গাড়ির কাছে এলো। হাতে একটা সুদৃশ্য হলুদ রঙের ছাতা। Carriefour নামাঙ্কিত ছাতাটি আমাকে দিয়ে মাফ চাইলো। সেলসম্যান ইংরেজি বলতে পারে না। তাই ড্রাইভার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বোঝালো যে, আমরা যে টিভিটা কিনেছি তার সঙ্গে এই ছাতাটি উপহারস্বরূপ। আমাদের দেশে যেমন গুড়ো দুধ বা সাবান কিনলে উপহার দেয়।

ছাতাটির দাম নিয়ে ভাবছিলাম না। মিলিয়ে দেখছিলাম আমার দেশে যখন কোনো কম্পানি তার পণ্যের সঙ্গে উপহার ঘোষণা করে তখন দোকানদাররা নেহায়েত না চাইলে বাড়তি উপহার দেয় না। অথবা বলে উপহার ফুরিয়ে গেছে। আরো হরেক রকমের অজুহাত। এই ছাতাটি এ জন্য আমার কাছে *সততার প্রতীক।*

গাউসিয়া বা নিউ মার্কেটের মতো আয়তন বিশিষ্ট একটি বহুতল মার্কেটে কে মালিক তা খুজে পাওয়া যাবে না। শুধু সেলসম্যান বা গার্লরা এই বিশাল মার্কেট পরিচালনা করছে। তাদের সততা ও নিষ্ঠারই জীবন্ত প্রতীক এই ছাতাটি। আজো এই ছাতাটি আমার ঘরে শোভা বর্ধন করছে। ড্রইং রুমে ঝোলানো রয়েছে একটি সততার প্রতীক।

লালবাগ, ঢাকা থেকে

থাইল্যান্ডে

– রাফি সা'দ

১৯৯৩ সালের জুলাই মাসের কথা। তখন ব্যাংককে থাকি আমরা। বাবা, মা, এগারো বছরের আমি আর ছয় মাস বয়সী আমার পিচ্চি ভাই। উপলক্ষ্য হচ্ছে, বাবার এক বছরের জন্য ডাবলিউএইচও-র ফেলোশিপ পাওয়া। থাইল্যান্ডে তখন ঘোর বর্ষাকাল। থাইরা বর্ষাকালকে বলে *মোনসুম।*

মোটেলের কাছেই সব কিছু হওয়ায় আমরা হেটেই শপিং করতাম। বারকয়েক ভিজে জবজবে হবার পর একটা ছাতা কেনা আমাদের জন্য জরুরি হয়ে উঠলো। অনেক খুজে আমার মাতাজানের প্রিয় সবুজ রঙ-এর ছাতা কেনা হলো আমাদের দেশের টিপ ছাতার মতোই। তবে বিশেষভাবে ভাজ করলে মাত্র ছয় ইঞ্চি লম্বা দেখায়। সুন্দর হাতের মুঠোয় রাখা যায়। সমস্যা হচ্ছে ভাজ করা এবং ভাজ খোলা। এমন হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয় যে, সুপার-ডুপার ছাতার ভাজ খুলতে খুলতে অর্ধেক ভেজা সারা। এছাড়া আমরা মানুষ হচ্ছি পৌনে তিনজন। এক ছাতায় এতোগুলো মাথা আটে না। আরেকটা ছাতা কেনা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাড়ালো।

এবার আমরা একটা ছাতার জন্য আশপাশের দোকান–পাট, বাজার–ঘাটগুলোতে গরু খোজার মতো করলাম। কিন্তু হায়! *এতো চাই তবু কেন পাওয়া নাহি যায়।* সব জায়গায় শুধু ভাজে ভাজে, ছাতা থরে–বিথরে সাজানো। কি আর করা! একই রকম ছোপ ছাপ বিশিষ্ট নীল রঙের ছত্রবাবাজিকে কেনা হলো। মাথার সমস্যা মিটে গেল।

একদিন হেটে ঘুরতে ঘুরতে আমরা কমার্শিয়াল এলাকায় চলে গেলাম। এখানে ফুটপাথ থেকে সোজা আকাশে উঠে গিয়েছে বিশাল সব অট্টালিকা। হঠাৎ ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি নামলো। নড়বড়ে ছত্রদ্বয় কোনো কাজেই আসছে না। একদিকে ছাতা ধরলে অন্যদিক থেকে বারিষধারা এসে ভিজিয়ে দেয়।

কাছেই এক বাসস্ট্যান্ডের দিকে ছুটলাম আমরা। আমি আগে আগে নীল ছাতা নিয়ে, বাবা–মা আর ছোট ভাই সবুজ ছাতার নিচে এক সঙ্গে। ছোটভাই বাবার বুকের সঙ্গে থাই পদ্ধতিতে বাধা অবস্থায় ঝুলছে, মজার দৃশ্য। দৌড়ানোর সময় আমার হাত থেকে ছত্রবাবাজি উড়ে গিয়ে গোটা দশেক ডিগবাজি খেলো। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়ে গিয়েছে তখন। ছাতা তুলে নিয়ে দেখলাম গোটা কয়েক ডাটি ভেঙে গেছে। রাস্তা প্রায় ফাকা। ভাঙা ছাতা তুলে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে ছুটলাম। ততোক্ষণে নীল রঙের বড় এসি বাস চলে এসেছে।

আমার লাফালাফিতে বাবা–মা বড়ই বিরক্ত। বাসের দরজায় দাড়িয়ে আমাকে চেচিয়ে ডাকছে। আমার এই ভয়ঙ্কর ঝড় দারুণ ভালো লাগছে। বৃষ্টির মধ্যেও বাসের গাধা ড্রাইভার এসি ছেড়ে রেখেছে। ঠাণ্ডায় কাপতে কাপতে ছাতার অক্ষমতার কথা ভেবে মোটেলে পৌছে জ্বরে শয্যা নিলাম।

বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে আমাদের মোটেলের নাম ছিল *নিউ ওয়ার্ল্ড হাউস,* রুম নাম্বার ২৩৪। আর জায়গাটার নাম *বাংলামপু।* মোটেলের সামনে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। খোলা আঙিনার ওপর বড় ছাতা দিয়ে ঢাকা। নাম *ওপেন এয়ার ফুডস।* সন্ধ্যার সময় আমাদের ব্যালকনিতে আমরা বসে থাকতাম। তখন দেখা যেতো বিশেষ একটা ছাতার নিচে, বিশেষ একটা টেবিলে একটি লোক এবং পাচ সাতজন মেয়ে বসে আছে। একটু পর পর এক একজন লোক আসে এবং এক একজন মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তখন বুঝতাম না। তবে এখন বুঝি যে, ওপেন এয়ার ফুডস–এ অনেক কিছুই ওপেন।

কিছুদিন পর আমাদের শখ হলো থাই সমুদ্র দেখার। ব্যাংকক–এর সবচেয়ে কাছের সমুদ্র হলো *ফাতাইয়া বিচ।* অনেক ঝামেলা করে আমরা যখন ফাতাইয়া পৌছালাম তখন সমুদ্র দেখার উত্তেজনা নেই হয়ে গেল। বিচের হলুদ সঙ্কীর্ণ বালুকাবেলার এখানে–সেখানে আবর্জনা। এবং সমুদ্রের পানি বুড়িগঙ্গার নোংরা পানির চেয়েও কালো।

সঙ্গের এক ভদ্রলোক বললেন, আমাদের কক্সবাজারে তো তাও কিছু *ছাতি–ফাতি* ছিল। এখানে সেটুকুও নেই।

একজনের পরামর্শে আমরা একটা ইয়টে চেপে দূরের এক আইল্যান্ডে গেলাম। দ্বীপটা ছিল একটা ব্লু লেগুন আইল্যান্ড। অসীম বিস্তৃত সৌন্দর্য যার নীল আকাশের সঙ্গে ভালোবাসা। আর এই দ্বীপে *ছাতি ফাতি*–ও ছিল, ছাতার নিচে বিকিনি পরিহিত সুন্দরীরাও ছিল। আহ, অপূর্ব!

শেষের দিকে আমরা বেড়াতে গিয়েছিলাম *দি এলিফ্যান্ট শো* আর *ক্রোকোডাইল ফার্ম*–এ। বলে রাখা দরকার, থাইল্যান্ডে গোটা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাতি রয়েছে। আর এ দেশই কুমিরের চামড়া রফতানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। ক্রোকোডাইল ফার্মে থাই ওরিয়েন্টাল আর্টের এক দোকানে

বাশের তৈরি লাল কাপড়ের ছাতা দেখলাম। *মোনসুম* তখন শেষ। রোদের জন্য আমরা বিখ্যাত থাই লাল ছাতা কিনলাম।

ঢাকা থেকে

বড় সাধ

– মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

আমি সবেমাত্র অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। আমার মেসটি কলেজ থেকে বহু দূরে। পায়ে হেটে কলেজে যেতে প্রায় বিশ পচিশ মিনিট সময় লাগে। আমাদের কলেজ নিয়মিতভাবে হচ্ছে। এদিকে কাঠফাটা রোদ থেকে বাচার জন্য একটি ছাতা কিনলাম।

ছাতা মাথায় দিয়ে কলেজে যেতাম। সেদিন আমাদের ডিপার্টমেন্টের এক মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হলাম। মেয়েটির নাম মার্জিনা। দেখতে বেশ সুন্দরী। আমাদের মেসের একটু দূরেই এক মহিলা মেসে থাকে সে। পরিচিত হওয়ার পর থেকে আমরা প্রায়ই এক সঙ্গে কলেজে আসা–যাওয়া করি। কিন্তু সমস্যা হলো এখানেই।

আমরা দুইজন। কিন্তু ছাতা মাত্র একটি। মার্জিনার কোনো ছাতা নেই। দুইজন পাশাপাশি চলার পথে একজন ছাতার ছায়ায় থাকবে, অন্যজন রোদ্রে জ্বলবে তা মানবতা বিরোধী মনে করে ছাতাটি মার্জিনার মেস পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে বন্ধ করতাম এবং আসার সময় সে মেসে চলে গেলে আবার ছাতা মাথায় দিয়ে চলে আসতাম।

কয়েকদিন পর আমরা মোটামুটিভাবে আরো ঘনিষ্ঠ হলাম। এর কিছুদিন পর মার্জিনা একটি ছাতা কিনলো। এবার দুজনেই ছাতা মাথায় দিয়ে কলেজে যাওয়া–আসা করতে লাগলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন মার্জিনার ছাতাটি হারিয়ে গেল। আমরা দুজনেই লাইব্রেরিতে বসেছিলাম। কিছুক্ষণ পর ক্লাস করার জন্য ছাতাটি রেখেই মার্জিনা চলে আসে। ক্লাস শেষে মেসে আসার সময় মনে হলো। তা আর খুজে পাওয়া যায়নি।

আবারও আগের মতো ছাতা বন্ধ রেখেই রোদের তাপ সহ্য করে ক্লাস করতে লাগলাম।

সে একদিন আমাকে বললো, আমার জন্য তুমি ছাতা বন্ধ করে রেখে কলেজে যাওয়া–আসা করো, তোমার কষ্ট হয় না?

বললাম, এ আবার কি? ছেলেদের আবার রোদে চলাচল করাটা কোনো কষ্টের কাজ হলো নাকি?

এভাবে কয়েকদিন যাতায়াতের পর একদিন কলেজে যাবার পথে সামান্য বৃষ্টি হতে লাগলো। তবুও আমাদের ছাতা বন্ধই রয়েছে। সামান্য বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমরা কলেজ মাঠ পর্যন্ত আসি। কলেজ মাঠের কাছে এলে খুব জোরে নামে বৃষ্টি। কলেজ মাঠটি বিরাট।

যাই হোক। বৃষ্টি জোরে শুরু হলে মার্জিনা আমাকে বললো, এই ভিজে গেলাম তো, ছাতাটি মেলো? কালবিলম্ব না করে ছাতাটি মাথায় ধরলাম। সে সামান্য আগে এবং আমি পেছন হয়ে ধীরে ধীরে হাটতে লাগলাম। আমার এক হাতে ছাতা, অন্য হাতটি কখন যে মার্জিনার বাহুতে গেছে টের পাইনি। হাতটি মার্জিনার ঘাড়ে দিলাম, মার্জিনা বাধা দিল না। তার চুলের গন্ধে মাতাল আমি। হাতটি দিয়ে তাকে আমার দিকে আরো টেনে আনতে আনতে বললাম, মার্জিনা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমরা কলেজ ভবনের কাছে আসতেই একটি বাতাসের ঝাপ্টা এসে ছাতাটিকে উল্টিয়ে ভেঙে ফেললো। আত্মউপলব্ধি করলাম। ছাতাটি আমাদের দুজনকে অতি ঘনিষ্ঠ এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়ে গেল। সেদিন থেকে আমরা দুইজন ভালোবাসার জোয়ারে ভাসতে লাগলাম। তাকে জীবন সঙ্গিনী রূপে কাছে পেতে বড় সাধ আমার।

দিনাজপুর সরকারি কলেজ থেকে

মিষ্টি বৃষ্টি

– শহীদ

আমরা তখন চট্টগ্রাম থাকতাম। ষোলশহরে বাসা। বাবা চাকরি করতেন আমিন টেক্সটাইল মিলে। আমাদের বাসা মিলের বাইরে। মিলের কোয়ার্টারেও অনেকে থাকতো।

এখানে অনেকের মাঝে থাকতেন অন্তরাআপু। ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। আমি তখন ক্লাস এইটে। বয়সের তুলনায় বেশ বড়সড়ো ছিলাম। কোয়ার্টারে মাঝে মাঝে যেতাম, বিশেষ করে অন্তরাআপুদের বাসায়। তার মায়ের রান্না আর অন্তরাআপুর সঙ্গে গল্পের টানে। অন্তরাআপু হাত নেড়ে চেড়ে কলেজের মজার কথা বলতেন। শুনতাম, হাসতাম এবং চেয়ে দেখতাম। আমার চোখে দেখা সেরা সুন্দরী ছিলেন তিনি। যেমন সুন্দর তার চোখ তেমনি তার হাসি। হাসলে যেন চোখমুখ এক সঙ্গে হেসে উঠতো। আপুও মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসতেন।

এক ছুটির দিন বেলা দশটা নাগাদ তাদের বাসায় গেলাম।

আপু বললেন, শহীদ তোদের বাসায় আজ যাবো, চল। সেলাই তুলবো। বাশের ডালা আর কয়েকটা সুতার গুটি দেখালেন আপু।

চলেন।

ছাতা নিয়ে যা, আকাশে মেঘ। অন্তরাআপুর মা বললেন।

সময়টা ছিল বর্ষাকাল। আর চট্টগ্রামের বৃষ্টির কোনো ঠিক–ঠিকানা নেই। এই আছে তো এই নেই। আবার যখন ঝরছে তো থামার নাম নেই।

মিল থেকে আমাদের বাসায় যাওয়ার শর্টকাট রাস্তায় আমরা পা বাড়ালাম। এ পথে সমান করে কাটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা পথ যেতে হয়। এখানে কোনো বাড়ি–ঘর নেই। এরপরে রেল ক্রসিং। সেখান থেকে রিকশায়।

তার পরনে ছিল আকাশি রঙের সালোয়ার। প্রচণ্ড রোদে আকাশের যে রঙটা হয় সেই রঙেরই জর্জেটের পাতলা ওড়না। অন্যান্য দিনের মতো আপুর ফিগারে পোশাকটা চমৎকার মানিয়েছিল। ডালা ও সুতার ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে আপু বললেন, তাড়াতাড়ি চল, বৃষ্টি আসবে।

তাকে এবং আকাশকে দেখে বললাম, আসুক।

আকাশের আসল রঙ যেন আমার পাশে। তাই আসল রঙ হারিয়ে আকাশের মুখটা এতো গোমড়া। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই আকাশ ভেঙে পড়লো। আপু দ্রুত ছাতা মেললেন। কিন্তু লেডিস ছাতায় পাহাড়ি বৃষ্টি মানছিল না। এবং বাতাস বৃষ্টিকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি একটুখানি দূরত্ব রাখার চেষ্টায় ভিজে যাচ্ছিলাম।

ভিজে যাবি তো! কাছে আয়।

আমাকে কাছে টেনে নিয়ে আমার কাধে একটা হাত তুলে দিলেন অন্তরাআপু। বুকের পাশটা আমার বাম পাশে ঠেকলো। তাকিয়ে দেখলাম, আপুর চোখ ভরা হাসি।

কেমন ঝুম বৃষ্টি, না!

তার গায়ের সালোয়ার চুয়ে বৃষ্টি যেন নীল হয়ে উঠলো। আকাশ তার হারানো রঙ ফিরে পেল। সুতো ভেজার ভয়ে পলিথিনে গিট দিলাম। বাম হাতের কনুইয়ে যেন বিজলি চমকে উঠলো।

শহীদ, আমার ওড়না!

তাকিয়ে দেখলাম তার দেহের বাম পাশে থেকে ওড়নার বাড়তি অংশ নিয়ে বৃষ্টি ও বাতাস কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। আমার বাম হাতটা সামনের দিকে নিয়ে ধরার চেষ্টা করলাম। বিফল হয়ে তার পেছন দিক দিয়ে অবাধ্য ওড়নাটা মুঠোয় আনলাম। ততোক্ষণে আপুর বুকের কাছটায় ওড়না সরে গেছে।

কেমন মজা, তাই না? আপু বললেন।

আমার হৃদপিণ্ড যেন বের হয়ে আসবে এমন মনে হচ্ছে। কোনো রকমে বললাম, হ্যা, মজা।

আমার বাম হাতটা তখন আপুর কোমর বেষ্টন করে আছে। বাতাসের তাড়নায় তখন আপু ছাতাটাকে একেবারে আমাদের দেহের সঙ্গে লাগিয়ে নিয়েছে। আমার চোখের সামনে বৃষ্টির স্রোত বয়ে চলেছে। পথের কোনো শেষ নেই বলে মনে হচ্ছিল। রেল ক্রসিংয়ে এসে রিকশা দেখলাম না।

চল, রেল লাইন ধরে যাই।

আপুর প্রস্তাবে মাথা নাড়লাম।

তার হাতটা তখন শক্ত করে আমার গলা পেচিয়ে। তার গায়ের একটা খুব সুন্দর গন্ধ পাচ্ছিলাম। আমার মাথা ঝিম ঝিম করছিল। আপুর শরীরের উষ্ণতায় ভেসে গিয়ে কোনোমতে বললাম, এই বৃষ্টি যদি না থামে?

না থামুক, আমরা এভাবেই চলে যাবো। উত্তর এলো।

আমার ইচ্ছা হচ্ছিল বলি, সারা জীবন এভাবেই চলতে থাকুক।

সেই কৈশোরের স্বপ্নালু চোখে ছাতার এই মিষ্টি স্বপ্ন আজো আমার চোখে ভাসে। এতো বৃষ্টি হয় কিন্তু সেই নীল বৃষ্টি আর দেখি না। চোখ বুজে মাঝে মাঝে কেবল উষ্ণতা টের পাই। এবং পাই একটা গন্ধ... মিষ্টি...

চট্টগ্রাম থেকে

পিতৃস্নেহ

– সাজিদ আখন্দ

আমি বরাবরই একটু নাস্তিক টাইপের। ছোটবেলা থেকেই ধর্ম-কর্মের প্রতি আমার আগ্রহ কম। অবশ্য সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস আছে ষোল আনা। তবে আমার বাবা ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই ধার্মিক ব্যক্তি। সরকারি চাকুরে ছিলেন। তাই দশটা থেকে পাচটা অফিস করায় মসজিদে যাতায়াত তার নিয়মিত ছিল না। ধর্ম-কর্ম করার ব্যাপারে তিনি জোরজবরদস্তির পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি এ জন্য আমাকে বোঝাতেন এবং চাইতেন আমি যেন অন্তত শুক্রবার জুম্মার নামাজে তার সঙ্গী হই।

এ রকমই একদিনের কথা আজ মনে পড়ে। আব্বা অনেকবার বলা সত্ত্বেও সেদিন নামাজে যাইনি। দিনটি ছিল শুক্রবার। খুব সম্ভবত জুমাতুল বিদা। আমি তখন বেশ ছোট। স্কুলে পড়ি। বাসার

সামনেই ছিল মসজিদ। তাই বাসা থেকে মুসল্লিদের গতিবিধি বেশ সহজেই নজরে আসতো। আমাদের বাসায় একটা নিয়ম ছিল যে, শুক্রবার দুপুরে সবাই এক সঙ্গে বসে খাওয়া। আব্বা নামাজ থেকে ফিরেই পাঞ্জাবি খুলে পায়জামা পরেই বসে যেতেন টেবিলে। আম্মা গোসল আগেই সেরে রাখতেন। তারপর সবাই এক সঙ্গে বসে আম্মার হাতের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় রান্নার সদ্ব্যবহার করতাম। ছুটির দিন উপলক্ষে আমাদের বাসায় সপ্তাহে একদিন বিশেষ রান্না হতো।

বাসার কাছেই মসজিদ ছিল। তাই আম্মা গোসল সেরে, রান্নাবান্না গুছিয়ে জানালায় দাড়িয়ে বাবার প্রতীক্ষা করতেন। নামাজ সেরে আসার পথে আব্বাকে দূর থেকে আম্মা জানালা দিয়ে দেখতে পেয়ে বলতেন, ওই তোর বাবা আসছে। কিন্তু সেদিন নামাজ শেষে আব্বার প্রতীক্ষায় জানালায় আম্মা দাড়িয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ বৃষ্টি নেমে আসে।

আম্মা আমাকে বললেন, তাড়াতাড়ি ছাতা নিয়ে যা, তোর আব্বা মসজিদে নামাজ শেষে অপেক্ষা করবেন। আমি ছাতা নিয়ে ঘর থেকে বের হতে না হতেই আম্মা জানালা দিয়ে তাকিয়ে বললেন, নামাজ শেষ, তাড়াতাড়ি যা।

মসজিদের সামনের গেটে দেখি বাবা তার প্রিয় জায়নামাজ হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আছেন।

আমাকে ছাতা হাতে দেখে বলে উঠলেন, আমি জানি, আমার ছেলে ঠিকই ছাতা হাতে আমাকে নিতে আসবে।

আব্বা আমার হাত থেকে ছাতা নিতেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। আমাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আব্বা আরেক হাতে ছাতা নিয়ে বাসার দিকে এগিয়ে চললেন। সেদিন এমনই বৃষ্টি নেমেছিল যে, ছাতায় বাগ মানছিল না। তবুও আমাকে জড়িয়ে ধরে আব্বা এমনভাবে আগলে রাখলেন যাতে আমার শরীরে একটা বৃষ্টির ফোটাও না পড়ে। আমার ছোট্ট শরীরটাকে বাবা নিজের দেহ দিয়ে বৃষ্টি থেকে আড়াল করলেন। বাসায় ফিরে দেখি, আব্বা পুরো কাকভেজা হয়েছেন অথচ হাফপ্যান্ট পরে থাকায় আমার পা দুইখানি ছাড়া শরীরের উপর বা নিচের অংশ অবশ্য তেমন একটা ভেজেনি।

আমি এখন ইউনিভার্সিটির ছাত্র। আর বাবাও গত হয়েছেন তা প্রায় বেশ অনেক দিন। বাসা বদল করতে গিয়ে ঘরের কোণায় সেই ছাতাটিকে শতছিন্ন দেখে সেদিনের কথা মনে পড়লো। অনেক বছর পর হওয়ায় ছেলেবেলার সেই ছাতাকে কেন্দ্র করে পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহের বহিঃপ্রকাশের ঘটনাটি আজো আমার স্মৃতিতে নাড়া দেয়। তখন বাবার কথা মনে করে বহু কষ্টে আপনাতেই চোখে দুই ফোটা জলের জন্ম হয়।

কল্যাণপুর, ঢাকা থেকে

দুরাশা

– কাজী সাইফুদ্দিন অভি

এক সময় বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দে আমার ঘুম ভাঙলো। ততোক্ষণে ঘড়িতে দুটা বাজে। থার্ড ইয়ার কোর্স ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণের শেষ দিন। আমাকে টিএসসি-র জনতা ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে। তাই অধীর অপেক্ষা নিয়ে বসে আছি কখন বৃষ্টি থামবে।

বৃষ্টি কিছুতেই থামছে না। পড়ে গেলাম মহাফ্যাসাদে। বাইরের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে মনে পড়লো একটা ছাতার কথা যদিও আমার কোনো ছাতা নেই। শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি নামার যে ছবি আমাদের চোখে ভাসে তার দেখা এ পর্যন্ত মেলেনি। তাই ছাতার প্রয়োজন তেমন একটা অনুভব হয়নি। কিন্তু

আজ ছাতার প্রয়োজন হাড়ে হাড়ে অনুভব করলাম। ছাতা না থাকায় বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছি আর ভাবছি, বৃষ্টি না থামলেও আমাকে যেতে হবে। বৃষ্টি কিছুতেই থামছে না। ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেল। সিদ্ধান্ত নিলাম বৃষ্টিতে ভিজেই ব্যাংকে যাবো। যেই কথা সেই কাজ।

আমার পাচ তলার রুম থেকে নিচে নামলাম। ততোক্ষণে বৃষ্টির গতি কিছুটা কমেছে। তবে একদম থেমে যায়নি। যেতে যেতে নিশ্চিত ভিজে যাবো।

হলগেট থেকে রিকশা নিয়ে যাবার কথা মনে পড়লো। হলগেটে গিয়ে কোনো রিকশা না পেয়ে প্রকৃতিকে গালি দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মাথায় দিয়ে হাটতে শুরু করলাম। বৃষ্টির ফোটা আমার মাথায় পড়ছে। রুমাল বৃষ্টির পানি প্রতিরোধ করতে না পারায় আমার সারা শরীর ভিজে যাচ্ছে। কোনো উপায়ান্তর না দেখে মাঝে মধ্যে রুমাল দিয়ে মাথা মুছছি আর হাটছি। মলচত্বরের মাঝপথে যেতেই বৃষ্টির গতি কিছুটা বেড়ে গেল। আমার সামনেই একটা মেয়ে ছাতা মাথায় হেটে যাচ্ছে। কোনোদিকে না তাকিয়ে মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছি। ততোক্ষণে লেকচার থিয়েটারের কাছে চলে এসেছি।

পেছন থেকে একটা মেয়েলি কণ্ঠে শুনতে পেলাম, এক্সকিউজ মি।

পেছন ফিরেই দেখি ছাতা মাথায় মেয়েটি। বললো, কোথায় যাবেন?

বললাম, জনতা ব্যাংকে।

মেয়েটি আবার বললো, আপনার সারা শরীর ভিজে যাচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজলে জ্বর আসবে। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমার ছাতাটা নিয়ে যান। আমি আর সামনে যাবো না।

বললাম, ছাতার দরকার হবে না। ভিজেই তো গেছি।

মেয়েটি আবারও অনুরোধ করলো।

আমি আর না বলতে পারলাম না। ধন্যবাদ জানালাম মেয়েটিকে। বললাম, আপনার নাম কি? কোথায় আপনাকে ছাতাটা দিতে যাবো।

মেয়েটি বললো, আমি সুমু, রোকেয়া হলের নিউ বিল্ডিংয়ে থাকি। যখন সময় হবে তখন আপনি ছাতা দিয়ে যাবেন।

আমি হ্যা সূচক মাথা নাড়িয়ে মাথাটা মুছে ছাতা মাথায় দিয়ে হাটছি আর ভাবছি মেয়েটির কথা। এভাবে আমাকে ছাতাটা না দিলেও তো পারতো। ব্যাংকে গিয়ে ফরম পূরণের টাকা জমা দিয়ে বাইরে এলাম। এখন বৃষ্টি নেই। সুমুর ছাতাটা দেয়ার জন্য রোকেয়া হলের সামনে গিয়ে তার নামে স্লিপ পাঠালাম। পনেরো মিনিট পর সুমু এলে তার হাতে ছাতাটা দিয়ে বললাম, আপনার এ উপকারের কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

সুমু বললো, এটা আর এমন কি করলাম। দুজনের মধ্যে আরো কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা চললো।

সুমু বললো, আপনার নামটা কিন্তু জানা হয়নি।

বললাম, অভি।

আপনার নামটা সুন্দর। পাচটায় বাসডিপো থেকে বাস ছেড়ে যাবে। তাই বেশি সময় অপেক্ষা করতে পারলাম না।

পাচটা বাজতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। সুমুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার সময় সুমু হাসতে হাসতে বললো, একটা ছাতা কিনে নেবেন, না হলে এভাবে বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করবে।

আমি ভেবেছিলাম ছাতা আমার এবং সুমুর মধ্যে প্রেম ঘটিয়ে দেবে। কিন্তু আসলে তা হয়নি। তারপর থেকে ক্যাম্পাসে সুমুকে আর কোনোদিন দেখিনি।

ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ঢাকা থেকে

সততা

– মোহাম্মদ নূরুল মোমেন

সহকর্মীদের বিদায় অনুষ্ঠান শেষে বাবা কুরআন শরিফ, জায়নামাজ, তসবিহ আর ছাতা নিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। এগুলো বাবার সহকর্মীরা বাবাকে উপহার দিয়েছিল। অভ্যাসগতভাবে বাবা এলেই আমরা দুই ভাইবোন বাবার কাছে ছুটে যেতাম। সেদিনও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং মাও এসেছিলেন।

বাবা বিষণ্ন মনে আমাদের বলেছিলেন, আমার দিন তো ফুরালো। যা উপার্জন করেছি তাতে দুবেলার দুমুঠো ভাত আর তোমাদের পড়াশোনার খরচ চালিয়েছি। তোমাদের জন্য উদ্বৃত্ত কিছুই রাখতে পারিনি। মনে রেখো, সততা জীবনের বিরাট সম্পদ। তোমাদের বাবা চিরকাল কেবল সততার কাছেই নতি স্বীকার করেছে।

সবাই নিশ্চুপ, ঘরে পিনতনের শব্দ পর্যন্ত নেই।

মা শুধু বাবাকে বলেছিলেন, এতো নিরাশ হচ্ছেন কেন, আপনি তো আমাদের ছায়া। এসব কথা বাদ দেন তো!

তখন আমি ও বড়আপা বাবাকে ঘেষে দাড়িয়েছিলাম। বাবা হাতে জায়নামাজ ও তসবিহ তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, এই নাও, এটিতে তুমি নামাজ পড়ো।

বড়আপার হাতে পবিত্র কুরআন শরিফ আর আমার হাতে ছাতাটি তুলে দিয়েছিলেন। আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাবা নিজেকে এমন নিঃশেষ করে ঢেলে দিতেন। এর কয়েকদিন পরেই পৃথিবীতে বাবার শারীরিক অস্তিত্বের বিনাশ ঘটে।

আজো রোদে পুড়ি, বৃষ্টির জলে ভিজি তবুও বাবার দেয়া ছাতাটি মাথার ওপর মেলে ধরার সাহস পাই না। বাবার শেষ স্মৃতিচিহ্নটি নষ্ট হওয়ার ভয়টিই আমাকে এমন করেছে। ছাতাটির দিকে তাকালে বাবার জড়ানো স্মৃতিগুলো আমাকে দখল করে। আমি অশ্রুতে ভাসি। তাও ভালো, আজো বাবার ছাতাটি যত্ন করে রাখতে পেরেছি। কিন্তু জানি না, বিশ্বের প্রথম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে কতোটুকু সৎ আছি কিংবা থাকতে পারবো!

সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ থেকে

কালো ব্যাজ

হিরা

ছাতার কাপড়ের রঙ কালো এবং শোক পালনের অংশ হিসেবে কালো রঙ-এর ব্যাজ ব্যবহার করা হয়।

এমনিভাবে আমার অন্তরে ছাতা পরিয়ে দিয়েছে অদৃশ্য এক শোক ব্যাজ যা কখনো ভোলার নয়।

২০০০ সালে চট্টগ্রামে আমার বন্ধু পল্লবের কাছে বেড়াতে যাই। আমি এবং পল্লব ঠিক করলাম পতেঙ্গা যাবো। যেই না চট্টগ্রামের বাসস্ট্যান্ডে নামলাম ঠিক তখনি নামলো বৃষ্টি। শুরু তো হলো আর

শেষ হয় না। কি আর করা, এসে যখন পড়েছি! ঠিক করলাম ভিজতে ভিজতে যাবো। কারণ কাছে ছাতা নেই। বাস থেকে নেভিপোর্ট হয়ে সোজা পতেঙ্গা পর্যন্ত চলে এলাম। সেদিন ছাতা ছিল না। বিকল্প হিসেবে ছিল একটি নতুন কেনা গামছা। গামছার নিচে আমি ও পল্লব পাশাপাশি জড়াজড়ি করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সি-বিচে আসি এবং ঠিক করি, এরপর যেদিন আসবো সেদিন একটা নয়, দুইটা ছাতা সঙ্গে নিয়ে আসবো। সেদিন কাকভেজা হয়েও সারাদিন সি-বিচে ঘুরে ফিরে আনন্দ করে কাটিয়েছিলাম সন্ধ্যা পর্যন্ত। সূর্যাস্ত উপভোগ করেছিলাম। আজো পতেঙ্গায় সূর্যাস্ত হয়, এখনো বৃষ্টি হয়। এবং সেই বৃষ্টি ও ছাতার কথা মনে করিয়ে দেয় সেদিনের স্মৃতি। কেননা আজ আমার বন্ধু বেচে নেই। চলে গেছে বিধাতার কাছে।

ক্লাস এইটে পল্লবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ১৯৯৬ সালে আস্তে আস্তে সেই আমার প্রিয় বন্ধুতে পরিণত হয়। আজ সে নেই। কিন্তু কালো ছাতা দেখামাত্রই আমার বুকের মধ্যে থেকে আর্তনাদ করে ওঠে। কালো ছাতা পরিয়ে দিয়েছে আমার হৃদয়ে একটি কালো ব্যাজ।

দৌলিতপুর, খুলনা থেকে

কলা পাতা

– এমএএ মাসুম

বয়সটা ছিল ভালোলাগার। যে কোনো সুন্দর এ সময় দুর্বিনীতভাবে আকর্ষণ করতো। সারাক্ষণ ভাবতাম যদি সুন্দর একটা মানুষকে কাছে পাওয়া যেতো। কল্পনা করতাম সুন্দর এক মনকে নিয়ে যেন আমার একমাত্র প্রত্যাশাই ছিল যদি এমন কেউ থাকতো যার স্পর্শে পৃথিবীটা হতো স্বপ্নের মতো পদ্যময়।

মনের মতো এমনই একজনকে বিধাতা আমার জন্য পাঠিয়েছিলেন স্বর্গ থেকে। হ্যা, কাল্পনিক এক ছাতার সূত্র ধরেই তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সে ছাতার কাছে আজীবন ঋণী থাকবো। আজও ভাবি, সে ছাতা ছিল ভিন্নতর। সবার দৃষ্টিতে সেটা হয়তো বা ছেলেখেলা মনে হতেই পারে। কিন্তু বাল্যজীবনে যে ছাতার পরশ লেগেছিল তাতে স্মৃতির সিড়ি বেয়ে ভাবনার রাজ্যে গেলে ঠিকই খুজে পাওয়া যায় এক অনাবিল সৌন্দর্য।

তার সঙ্গে আমার অনেকগুলো মুহূর্ত কেটেছে আনন্দে। তাকে ভাবতাম বাস্তবতার উর্ধে। কিন্তু সে আজ হারিয়ে গেছে অজানা রাজ্যে। এখনো তাকে ভাবতে ভাবতে কেটে যায় আমার প্রতিটি নিঃসঙ্গ মুহূর্ত। আকাশের কান্না কিংবা তার হৃদয়ে ওঠা ঝড় আমাকেও অস্থির করে তোলে। মনটা আমার ছুটে যায় সেই বয়ঃসন্ধির আনন্দমুখর দিনে।

তখন পড়তাম ক্লাস নাইনে। ছাত্র হিসেবে বেশ ভালোই ছিলাম। প্রথম না হলেও পরের স্থানটা আমার জন্য নির্ধারিত ছিল। যে প্রথম হতো তাকে নিয়েই কাহিনী, তাকে ঘিরেই ছাতা সমৃদ্ধ স্মৃতিময় ঘটনার অবতারণা। তার সঙ্গে প্রথম যেদিন দেখা হয় সেদিনটি ছিল বৃষ্টিমুখর। আকাশের অবস্থা তেমন ভালো ছিল না বলে স্কুল ছুটি হয়েছিল সকাল সকাল। ভালোলাগার আবেশ নিয়ে আনমনে পথ চলছিলাম। কে জানতো, সেদিনই আমার ভালোলাগা বদ্ধ খাচায় আটকা পড়বে মায়াবিনীকে কেন্দ্র করে।

চলছি তো চলছিই। হঠাৎ দৃষ্টি আটকা পড়ে একাকী হেটে যাওয়া এক ললনার ওপর। মাপার উপায় ছিল না বলে বলতে পারি না কতোটা লম্বায় তার কেশ ছড়ানো ছিল। মেঘের দোলনা যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। যে কেউ প্রথমবার অন্তত সে কুন্তলারণ্যে হারিয়ে যেতে বাধ্য। ভুল দেখছি না তো? নিজেকে সামলে নিয়ে চলতে থাকি। হঠাৎ বেরসিক বৃষ্টি আমার কল্পনায় বাধা দেয়। পারলে সেদিন বৃষ্টির চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতাম। কিন্তু আজ বুঝি সে বৃষ্টির করুণাতেই তাকে পেয়েছিলাম।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের দুজনার কারো কাছে ছাতা ছিল না এবং আশপাশের কোনো স্থানই এমন ছিল না যে, দাড়িয়ে সামান্য বৃষ্টির হাত থেকেও বাচা যায়। দুজনারই পায়ের গতি বাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত একটা কলা গাছের ঝাড় দেখে থেমে যাই। তরুণী ঘুরে তাকায়। মুখে তার প্রস্তাবের ছাপ, চলুন না, এখানটায় দাড়ানো যাক। নীরব সম্মতি দিয়ে আমিও দাড়িয়ে যাই কলা পাতার সামান্য আবরণের নিচে। মাথায় একটা বুদ্ধি কাজ করে। বীরত্বপূর্ণ ভঙ্গিমা নিয়ে একটা কৃত্রিম ছাতা বহু কষ্টে সংগ্রহ করি। হ্যা, সেদিন মুখ দিয়ে কলার একটা পাতা কেটে সেটাকে ছাতা হিসেবে ব্যবহার করার উদ্যোগ নিই।

এ সেই ছাতা যার মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার সব ভালোলাগার কথা। সেদিন এ ছাতার জন্য এ ললনার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে হয়েছিল যোগাযোগ। এক পর্যায়ে আমাদের সে পরিচয় রূপ নিয়েছিল পরিণয়ে। তার সঙ্গে কেটে যাওয়া প্রতিটি মুহূর্তই আমার জন্য জীবনের সবচেয়ে প্রিয় এবং মূল্যবান। তার মাঝে সপে দিয়েছিলাম আমার স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নের একদিন সমাপ্তি ঘটেছিল। আমার মনে কষ্টের এক বোঝা চাপিয়ে দিয়ে হাসিমুখে সে বিদায় নিয়েছিল পৃথিবী থেকে। এরপর আর কারো ভালোবাসা আমার হৃদয় নাড়াতে পারেনি। আজো সেই প্রথম দিনের কথা, সেই কলা পাতার ছাতার কথা ভুলতে পারি না। বার বার আমাকে ডেকে নিয়ে যায় বেদনামুখর স্মৃতির মুহূর্তগুলোতে।

টাঙ্গাইল থেকে

ভুরুঙ্গা বিল

– আনিস আজিজ বাবুল

ময়মনসিংহের গৌরিপুরে অবস্থিত বিখ্যাত ভূরুঙ্গা বিল। কথিত আছে, নিয়ত করে এই বিলে আন্তরিকভাবে কোনো কিছু বিসর্জন দিলে মনের আশা পূরণ হয়। স্থানীয় ভাষায় এটাকে *ভোগ দেয়া* বলে।

এই বিলের প্রতি স্থানীয় মানুষের হৃদয়ে আছে অপরিসীম ভক্তি–শ্রদ্ধা। সাধারণ মানুষ অসুখ–বিসুখ, চাকরি, ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্য পেতে, বিদেশ গমন তরান্বিত বা নির্বিঘ্ন করতে কিংবা দুঃসাধ্য কোনো কাজ হাসিলের লক্ষ্যে এই বিলের পানিতে বিসর্জন দেয় অনেক কিছু। বিশেষ করে গাভীর দুধ, কলা। সাধারণ মানুষের ধারণা, খাস নিয়ত করে বিলে কিছু ফেললে প্রত্যাশা, স্বপ্ন অবশ্যই পূরণ হয়। যুগ যুগ ধরে এই ঘটনা ঘটে আসছে।

এসব কারণে এখানে তৈরি হয়ে গেছে কিছু বৈশিষ্ট্য, রীতি–নীতি, নিয়মের ধারা। যেমন এ বিল পারাপারের সময় কেউ ছাতা খুলবে না যতোই বৃষ্টি হোক কিংবা থাকুক ঘাম ঝরা রোদ। এর মূল কারণ কি তা অনেকেই না জানলেও প্রায় সবার ধারণা, ছাতা খুললে দুর্ঘটনা অনিবার্য। এই নিয়মের

সঙ্গে পরিচিত নয় এমন কেউ ভুল করে ছাতা খুলে ফেললে পাশাপাশি অন্যরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য দুর্ঘটনার জন্য সতর্ক করে দেয়। কাকতালীয়ভাবে আতঙ্কজনিত ছোটাছুটির ফলে কয়েকবার নৌকা ডুবি ঘটেছে বলে দুর্ঘটনা বিষয়ক সুসংস্কার সাধারণ মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল হয়েছে।

বর্তমানে মুক্ত চিন্তার শিক্ষিত মানুষজন নৌকা ডুবির প্রকৃত কারণগুলো জেনে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত, প্রবীণ জনগোষ্ঠির বেশির ভাগ মানুষ ঐতিহ্যবাহী কুসংস্কারের ধারক-বাহক হয়ে আছে। তারা এই বিলকে অলৌকিক ক্ষমতার আধার মনে করে। হয়তো এর অন্যান্য কারণও আছে। যেমন প্রচলিতভাবে মাছের চাষ না করলেও অফুরান মাছের উৎস এই বিল, পানি সুপেয়।

এক সময় এই বিলে মাছ শিকারে কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। শৌখিন এবং পেশাদার জেলেরা এখানে মাছ ধরতো। সম্প্রতি একটি মহল বিলটি লিজ নিয়ে মাছ শিকারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আরোপ করেছে।

এই বিল এলাকা মানুষের পরম প্রিয়, শ্রদ্ধার ও পবিত্র স্থান। অনেকে মনে করেন, অলৌকিক ক্ষমতাধর এই বিল এবং পানিকে অসম্মানিত করলে অমঙ্গল অবধারিত। এখানে ছাতা বিষয়ক প্রচলিত ধারাটি সবচেয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়।

ময়মনসিংহ থেকে

ভোটের হাওয়া

– মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান কামাল

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন আর মাত্র কয়েকদিন পরেই। এ বছর আমাদের ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হয়েছিলেন ছয়জন। বেশ জোরেশোরেই চলছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা। রঙ-বেঙয়ের পোস্টার ও ব্যানারে চারদিক একাকার। এদের মধ্যে একজন প্রার্থী ছিলেন আমার মামা যিনি একাধারে বারো বছর যাবৎ এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। আর একজন প্রার্থী ছিলেন অখ্যাত। তার নামও এর আগে কেউ শোনেনি। সবাই বলাবলি করছিল যে, তিনি তো তার জামানত হারাবেন। ঢাকায় তার একটি ছাতার কারখানা আছে। বেশ টাকা পয়সার মালিক। কাকতালীয়ভাবে তার নির্বাচনী প্রতীকও ছিল *ছাতা*। পরে শুনেছিলাম থানা নির্বাচন অফিসে কিছু ইনাম দিয়ে ছাতা মার্কাটা বাগিয়ে নিয়েছিলেন।

একদিন বিকেল বেলা আমাদের বাড়ির পাশের প্রাইমারি স্কুলের সামনে তার নির্বাচনী জনসভা চলছিল। অন্যান্য সবাই বক্তৃতা দেয়ার পর তার বক্তৃতার মাঝে এক পর্যায়ে তিনি বললেন, ভাইসব, মাটির ডাকে, মায়ের ডাকে আমি এবার আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের পদধূলি নিতে, আপনাদের খেদমত করতে।

আপনারা জানেন, আমার মার্কা ছাতা। আমি যদি আপনাদের মহামূল্যবান ভোট পেয়ে জয়যুক্ত হতে পারি তাহলে ছাতার মতো আপনাদেরকে ছায়া দিয়ে রাখবো।

এরপর নির্বাচনের তিন দিন আগে ইউনিয়নের সব ভোটারদেরকে মাথাপিছু একটা করে ছাতা দিয়ে গেলেন। এতেই নির্বাচনী হাওয়া ঘুরে গেল। এখন সবার মুখে শুধুই তার কথা, আর কালো ছাতার কথা, তার কালো টাকার কথা।

যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। মামা পরাজিত হলেন, জিতে গেলেন সেই কালো ছাতার মালিক, কালো টাকার মালিক। সেই অখ্যাত প্রার্থী।

বরিশাল থেকে

হালাল পয়সা

– মোহাম্মদ ছানাউল্লাহ হৃদয়

মাকে ছাড়া দুই এক রাত একা থেকেছি এমন রেকর্ড নেই। মামাবাড়িতে মা গেলে আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যেতো। রাত তো দূরের কথা, বিকেল হলেই বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠতো কখন মায়ের কাছে যাবো। আমাদের বাড়ি থেকে চার পাচ মাইল দূরে মামাবাড়ি। পায়ে হেটে কিংবা লঞ্চে যাওয়া যায়। হেটে যাওয়ার ভয়ে আমি লঞ্চেই যেতাম।

১৯৮৮ সালের কথা। তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা চলছে। মা তখন মামাবাড়িতে গেলেন। পরীক্ষার কারণে যেতে পারলাম না। মায়ের জন্য মনটা আমার ব্যাকুল হয়ে রইলো। কোনোমতে পরীক্ষা শেষ করলাম।

পরীক্ষা দিতে যাওয়ার দিন দুই তিন টাকা দেয়া হতো। তিন চার দিনে নয় টাকা জমিয়ে তিন কেজি জাম কিনলাম। মামাবাড়ি যাওয়ার জন্য লঞ্চ টার্মিনালে এসে বসে রইলাম। ছাতাটি এক পাশে ঝুলিয়ে রাখলাম আর জামের পুটলিটা কোলের ওপর নিয়ে বসে আছি। যথাসময়ে লঞ্চ এলো। তাড়াতাড়ি লঞ্চে উঠে গেলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর বৃষ্টি নামতেই আমার ছাতার কথা মনে হলো। টার্মিনালে ছাতা রেখেই লঞ্চে উঠে পড়েছিলাম।

মামাবাড়ির আগের ঘাটে নেমে গেলাম। ফেরার কোনো লঞ্চ নেই। কোনো নৌকাও আসছে না। সন্ধ্যা হতে আর বেশি বাকি নেই। একে তো ছাতার চিন্তা তার উপর পকেটে একটা টাকাও নেই। নৌকা ভাড়া দেয়ার জন্য এক টাকা দরকার। এমন জায়গায় দাড়িয়ে আছি যেখানে নৌকা ছাড়া যাওয়া যায় না। ছাতা হারানোর শোক ও মায়ের কাছে যাওয়ার চিন্তায় কান্না শুরু করে দিলাম। এমন সময় দেখি একটি নৌকা এসে থামলো। একজন জিজ্ঞাসা করলো, এই পুলা কান্দস ক্যান, কই যাবি। চোখ মুছতে মুছতে বললাম, সলিমগঞ্জ।

সে বললো, নৌকায় উঠ।

বললাম, টাকা নেই।

সে একটু চিন্তা করে বললো, টেকা লাগবো না, তাড়াতাড়ি উঠ।

নৌকায় উঠে ছাতার চিন্তায় কান্নাটা আরো বেড়ে গেল।

মাথায় হাত রেখে একজন আদর করে জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে, কাদছো কেন?

ছাতা হারানোর কথা শুনে বললেন, সামান্য একটা ছাতার জন্য কেউ এভাবে কাদে। টার্মিনালে গিয়ে দেখবে তোমার ছাতা ঠিকই আছে।

কিন্তু আমার কান্না থামলো না।

তিনি আমার নাম, ঠিকানা, অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। আমার কান্না থামানোর জন্য অনেক গল্প করলেন। কিন্তু কিছুতেই আমার কান্না থামে না। বিরতিহীনভাবে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেদেই যাচ্ছি।

নৌকা ঘাটে লাগার সঙ্গে সঙ্গে সবার আগে লাফিয়ে নেমে গেলাম। দৌড়ে টার্মিনালে গিয়ে দেখি ছাতাটা যেভাবে রেখেছিলাম সেভাবেই আছে। ছাতা পেয়ে আমার সে কি আনন্দ!

রীতিমতো নাচতে শুরু করলাম। আমার কান্না থামলো। বৃষ্টি থামলো আবার।
ছাতা মাথায় পায়ে হেটে অনেক কষ্টে মামাবাড়ি গেলাম বেশ রাত করে। এতো রাতে মামাবাড়ি যাওয়ার কারণ শুনে সবার সে কি হাসি।
মা আমাকে বললেন, হালাল পয়সার জিনিস কখনো খোয়া যায় না। হালাল পয়সায় আল্লাহ বরকত দেয়। বড় হয়ে যখন উপার্জন করবি তখন হালাল উপার্জন করবি। জীবনে অনেক শান্তি পাবি।
এমএসসি ফাইনাল ইয়ারে পড়াশোনা করছি। ছাতা দেখলে এখনো হারিয়ে যাই শৈশবের সেই স্মৃতিতে। নিজের অজান্তেই হেসে উঠি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

গরবিনী

– দিলারা পারভীন সিক্তা

১৯৯৭ সালে যাযাদিতে যখন আমার প্রথম লেখাটা বের হলো তখন ইউনিভার্সিটিতে পড়েন ভাইয়া। ভাইয়া তখন ছাতা হাতে নিয়ে ভিজতে ভিজতে এলেন।
আম্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, ছাতা হাতে নিয়ে ভিজছিস কেন?
ভাইয়া গর্বিত মুখে বললেন, সিক্তার প্রথম লেখা বের হয়েছে তো এ জন্য এটা তার উপহার। সে ব্যবহার করার আগে এটা কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। নে, ধর এটা। সুন্দর না ছাতাটা?
সব দাত বের করে বলি, খুবই সুন্দর।
বিকেলে ভাইয়ার বন্ধু মানিকভাই ডাকতে আসেন। আম্মা ধমকের সুরে বললেন, খবরদার, ছাতা ছাড়া বাইরে যাবি না, বৃষ্টিতে ভিজে তো ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস।
ছাতা পাবো কোথায়। ভালোটা আব্বা নিয়ে গেছে আর বাকিগুলো বড় বড় ডান্ডিওয়ালা। এগুলো আমি নিতে পারবো না।
না পারলে বাইরে যাবার দরকার নেই। আম্মার সোজা–সাপটা জবাব।
এদিকে মানিকভাইও নাছোরবান্দা, ছাড়বেই না।
অবশেষে হ্যাচ্চো হ্যাচ্চো করতে করতে আমার কাছে এলেন। কাচু–মাচু করে বললেন, তোর ছাতাটা দিবি, একটুও নষ্ট করবো না।
আমি তখন ছাতার গর্বে গরবিনী। বললাম, নিবি? নিয়ে যা, অসুবিধা কি।
সেদিন–ই যাওয়ার সময় ভাইয়া আছাড় খেয়ে ছাতার একটা স্টিক বাকা করে ফেলেন। আমার কাছে এসে বললেন, বাকাই যখন হয়ে গেছে তখন এটা আমার কাছে থাক, তোকে একটা নতুন ছাতা কিনে দেবো।
ভাইয়া এখন চাকরি করেন। কতো কিছু কিনে দেন। কিন্তু সেই ছাতাটা আর কেনা হয়নি।

গাজীপুর থেকে

উপলব্ধি

– মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

বালক বয়সে একবার কাকার সঙ্গে গ্রামের হাটে যাওয়ার সময় ছাতা নেয়ার জন্য মায়ের কাছে বায়না ধরলে মাকে বাবা বললেন, হারিয়ে যেতে পারে। তাই কম দামের পুরনো কাঠের বাটওয়ালা ছাতাটা দাও।

আমার বাড়াবাড়িতে মা লোহার বাটের নতুন ছাতাটাই দেন এবং ঠিকই সেটা হারিয়ে বাড়ি ফিরি।

ফলাফলে বদরাগী বাবা কাঠের বাটওয়ালা ছাতাটা দিয়ে মাকে পেটান। এবং অল্প সময়ের মধ্যে ছাতাটা ভেঙে যায়। বিষয়টা আজো আমার মনে জেগে আছে। আত্মতৃপ্তি এটুকু, লোহার বাটওয়ালা না হারালে মাকে হয়তো আরো অনেক বেশি মারের আঘাত পেতে হতো।

ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি, আমাদের গ্রামের আজিজ মিয়া ছাতা মার্কা নিয়ে চেয়ারম্যান পদে দাড়ান। কোনোদিন তিনি পাস করেননি। তাতে কি হয়েছে। সমাজে এখন তিনি রীতিমতো *ছাতা আজিজ* হিসেবে পরিচিত।

শাদা ছাতার ওপর বাংলাদেশ বিমান লেখা এই ছাতা মাথায় দেবো বিরাট শখ ছিল এক সময়। আমার বৃদ্ধ নানার ছিল এই ছাতা। কোনোভাবেই তিনি কাউকে সেটা দেন না। কারণ সেটা তার হজের স্মৃতি। নানা বেড়াতে এলে একবার সুযোগ বুঝে সরিয়ে ফেলি ছাতাটা। ঘরে রাখলে মা পেয়ে যাবেন ভেবে বাড়ির পাশে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। নানা যাওয়ার সময় বাড়ির সব মানুষ সব জায়গায় ছাতাটা খোজাখুজি করেও না পেয়ে শেষ পর্যন্ত চালপড়া খাওয়ানো হয়। পেট ফুলে উঠবে ভেবে ছাতা ফেরত দেয়ার চিন্তা করি। কিন্তু ঝোপের মাঝে সেটা আর পাইনি। কেউ হয়তো চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছিল। নানা পরে আমাকে মাফ করে দিয়েছিলেন।

ছোটবেলা যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়ি তখন দেখি গ্রামের মোড়ল চাচার সঙ্গে একজন লোক সব সময় একটা ছাতা মোড়ল চাচার মাথায় ধরে রাখে। পরে জেনেছি, লোকটি চাচার দূরসম্পর্কের ভাতিজা, চাচার চামচা। সত্তর দশকের প্রথমার্ধে দেশে এক ধরনের স্লোগান চালু ছিল সেটা হলো, *দিল্লিতে বা মস্কোতে বৃষ্টি হলে ঢাকায় ছাতা ধরা।* তখন এর অর্থ বুঝতাম না। বৃষ্টির স্থান আর ছাতা দূরত্ব আমার কাছে বেশ কৌতূহলের ব্যাপার ছিল।

এখন বুঝি, ভাতিজা কেন চাচার মাথায় ছাতা ধরে, দিল্লি–মস্কোতে বৃষ্টি হলে ঢাকা কেন ছাতা মেলে, জিল্লুর অ্যান্ড কোং কেন হাসিনাকে *বিশ্বনেত্রী* হিসেবে প্রচার করে।

যশোর থেকে

অনুভব

– এমএম মোস্তফা চৌধুরী বাবুল

অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম কোনো ছাতাওয়ালা পথচারীর জন্য। দুপুর থেকে সেই যে বৃষ্টি শুরু হলো এখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত। এরপরেও বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। পকেটে এতো বেশি টাকাও নেই যে, রিকশা করে বাসায় যাবো। বৃষ্টির দিনে রিকশা ভাড়া আবার আকাশ ছুই ছুই।

কিছুক্ষণ পর দেখলাম একজন তরুণী ছাতা নিয়ে যাচ্ছে। কোনো কিছু চিন্তা না করে তার ছাতার ভেতর ঢুকে গিয়ে বললাম, প্লিজ, আমাকে একটু সামনে এগিয়ে দেবেন।

ছাতার ভেতরে অলরেডি তো ঢুকেই পড়েছেন। বলুন, কোথায় যাবেন? তরুণীটি বিরক্ত মুখে কথাগুলো বললো।

তরুণীটির দিকে ভালো করে তাকালাম। দেখতে খুব সুন্দর। ঠোটে লিপস্টিক, মুখে পরিচ্ছন্ন মেকআপের আভাস। শরীর থেকে কড়া পারফিউমের গন্ধ আসছে। এই বৃষ্টির দিনে এতো সুন্দর করে সেজে কোথায় যাচ্ছে আল্লাহই জানে।

আপনি কোথায় যাবেন বললেন না যে?

যাবো কদমতলী, পকেটের অবস্থা তেমন ভালো নেই। তাই রিকশা করে যেতে না পেরে কোনো ছাতাসঙ্গীকে খুজছিলাম।

আমি কি আপনার ছাতাসঙ্গী?

তাই তো মনে হচ্ছে। তা না হলে এতোক্ষণ আপনার ছাতায় আমাকে আশ্রয় দিতেন!

তরুণীটি হাসলো। খুব সুন্দর হাসি। মানুষের হাসি যে এতোই সুন্দর হয় তা আগে দেখিনি।

আমার নাম বাবুল। অর্থনীতিতে মাস্টার্স পড়ি চট্টগ্রাম কলেজে। আপনার নাম কি? এই বৃষ্টির দিনে কোথায় যাচ্ছেন? এসব প্রশ্নের পাশাপাশি আরো অনেক কথায় জানতে পারলাম মেয়েটি সম্পর্কে।

সে বললো, আমার নাম দুলারী। কিন্তু সবাই ডাকে *দুলু* বলে। কুমিল্লার বিজয়গড়া আমাদের গ্রামের বাড়ি। খুব গরিব পরিবার আমাদের। সামান্য জমিজমা আছে। এগুলো চাষাবাদ করে কোনোমতে দিন চলে। চার ভাই, দুই বোনের মধ্যে আমিই বড়। বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায় এইচএসসি পর্যন্ত পড়ার পর লেখাপড়া আর করতে পারিনি। গ্রামের দূরসম্পর্কের এক চাচা চাকরি দেয়ার নামে চট্টগ্রামে আনে আজ প্রায় এক বছর হলো।

তারপর সে বললো, আপনি তো ভিজে যাচ্ছেন। আরো কাছে আসুন। ইচ্ছা হলে আপনার হাত আমার কাধে রাখতে পারেন। আমি কিছু মনে করবো না। কারণ আপনি আজ আমার ছাতাসঙ্গী।

তার কাধে হাত রাখলাম। শরীর থেকে পারফিউমের তীব্র গন্ধ অনুভব করছি। এই গন্ধ মনকে মাতিয়ে তোলে। প্রশ্ন করলাম, আপনার চাকরি হয়নি?

হয়েছে। তবে হোটেলে। সপ্তাহে তিন রাত আবাসিক হোটেলে থাকতে হয়। সুন্দর বলে ডিমান্ডটাও বেশি। তবে কষ্ট লাগে। আমি বাচতে চাই সুন্দরভাবে সুন্দর এই পৃথিবীতে। দুলুর কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো।

এসে পড়লাম *হোটেল*-এর সামনে। দুলু হোটেলের ভেতরে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় বললো, কেন জানি আপনাকে আমার ভালো লেগে গেল। তাই অনেক কথা বলে ফেললাম। আমার জন্য দোয়া করবেন।

নেমে এলাম রাস্তায়। বৃষ্টিতে ভিজেই হাটছি। দুলুর গায়ের গন্ধ আমার শরীরে অনুভব করছি। এই গন্ধটা বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এই গন্ধটা কি অপবিত্র?

মতিয়ারপুল, চট্টগ্রাম থেকে

পায়ে পা

– শাখাওয়াত

তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। একটি মেয়েকে পছন্দ করতাম। আমরা এক সঙ্গে আটজন প্রাইভেট পড়তাম। আমার পছন্দের মেয়েটিও আমাদের সঙ্গে প্রাইভেট পড়তো। মেয়েটি ছিল খুবই সুন্দর এবং অহঙ্কারী।

একদিন প্রাইভেট পড়ার সময় মেয়েটির পায়ে আমার পা লেগে যায়। পা লাগতেই সে আমার দিকে বাকা চোখে তাকায়। তাকাতেই আমি তাকে চোখ মারি। এতে সে ক্ষেপে যায়।

সেদিন তার সঙ্গে কোনো কথা হলো না। পরের দিন শুক্রবার। স্কুল বন্ধ। বন্ধের দিনে আমাদের প্রাইভেট পড়া ছিল নয়টায়। কিন্তু আমার পছন্দের মেয়েটি ভেবেছিল সাড়ে আটটায় প্রাইভেট। তাই সে পরদিন সাড়ে ৮টায় স্কুলে হাজির। প্রায় ৮টা ৪০ মিনিটের সময় বৃষ্টি এলো। বৃষ্টির ভেতরে ছাতা নিয়ে স্কুলে গেলাম। গিয়ে দেখি আমার পছন্দের মানুষ ছাড়া কেউ স্কুলে আসেনি। নয়টার সময় স্যার আসেন। প্রাইভেট পড়লাম মাত্র দুজনে। দশটা বাজে, বৃষ্টি বন্ধ হচ্ছে না।

স্যার বললেন, শাখাওয়াত, তুমি একে একটু এগিয়ে দিয়ে এসো। কারণ সে ছাতা আনেনি।

স্যারের কথামতো ছাতার নিচে নিয়ে তার বাড়ির দিকে হাটতে থাকি। প্রায় ষাট–সত্তর কদম হাটার পর তার পা পিছলে গেল। তখন সে স্থির থাকার জন্য আমার কাধের ওপর হাত রাখলো। আমিও তার ডান বাহুতে হাত রাখি। ঠিক সেই মুহূর্তে মুচকি হাসি দিল এবং বললো, আচ্ছা, তুমি সেদিন আমার পায়ে পা লাগালে কেন?

হঠাৎ করেই বলি, তোমাকে ভালোবাসি তাই।

সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো?

বললাম, হ্যা।

এভাবে কথা বলতে বলতে তাদের বাড়ির সামনে চলে এলাম। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। এবং আসার পথে আমার ছাতাটাকে ধন্যবাদ জানালাম।

কুমিল্লা থেকে

দায়মুক্ত

– জিএ মইনুল ইসলাম তপন

আমার জীবনে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি হারিয়েছি সেটি হলো ছাতা। সাধারণত বৃষ্টির সময়েই ছাতা বেশি ব্যবহৃত হয়। আর এ সময়টাতেই আমার ছাতাগুলো হারিয়েছে।

ছাতা নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে বের হয়েছি। গন্তব্যস্থলে নির্দিষ্ট জায়গায় ছাতাটি রেখে কাজ করছি এরই মাঝে বৃষ্টি পড়া শেষ। ফেরার সময় বৃষ্টিও নেই। ছাতার দরকারও নেই। ফলে ছাতার কথা মনেও নেই। খালি হাতে বাসায় ফেরার পর আমার স্ত্রী যখন ছাতার কথাটি মনে করিয়ে দেয় তখন হন্তদন্ত হয়ে সেই জায়গায় গিয়ে ছাতাটিকে আর যথাস্থানে পাইনি।

এ রকম বহুবার হয়েছে। ছাতা নিয়ে আমার রয়েছে অনেক বিচিত্র স্মৃতি যার দুটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

প্রথম ঘটনাটি ঢাকার। কোনো এক শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়তে মসজিদে যাবার সময় শুরু হলো বৃষ্টি। আমার কালো রঙের ছাতাটি নিয়ে বের হলাম। অনেক ছাতার মাঝে যেন চিনতে পারি সে জন্য আমার স্ত্রী এটি ভেতরের অংশে শাদা রঙ দিয়ে চিহ্ন একে দিয়েছে। নামাজ শেষ হওয়ার পর যথাস্থানে ছাতাটি খুজে দেখি সেটি নেই। অনেক খোজাখুজির পরও পেলাম না। মসজিদ থেকে ছাতাটি চুরি হয়েছে ভেবে বিষণ্ন মনে বাসায় ফিরি।

এর বেশ কয়েকমাস পরের ঘটনা। কোরবানির ঈদের আগে এক জুম্মায় মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছি। তখন শুনি মাইকে ইমাম সাহেব বললেন, পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা থানার এক বৃদ্ধ মুসল্লির কথা। তিনি এবার হজে যাবেন। তাই হজে যাবার আগে একটি বিষয়ে শুধু দায়মুক্ত হতে তিনি সুদূর পটুয়াখালী থেকে এসেছেন।

ইমাম সাহেবের বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, বেশ কিছুদিন আগে এই মুসল্লি নামাজ শেষে ভুলক্রমে নিজের ছাতার বদলে অন্যের ছাতা নিয়ে বাসায় ফেরেন এবং সেদিনই সন্ধ্যায় পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নৌপথে পটুয়াখালী চলে যান। এর মাঝে তার আর ঢাকায় আসা হয়নি। তাই এখন হজে যাবার আগে তিনি ছাতার প্রকৃত মালিককে ছাতাটি ফেরত দিয়ে দায়মুক্ত হতে চান।

ইমাম সাহেবের বর্ণনার সময় আমার সেই হারানো ছাতাটির কথা মনে পড়ে গেল। বৃদ্ধ হজযাত্রীর কাছে গিয়ে প্রমাণ স্বরূপ ছাতার ভেতরে চিহ্নের বর্ণনা দিয়ে আমার হারিয়ে যাওয়া ছাতাটি ফেরত নিলাম।

দায়মুক্ত হয়ে সেই বৃদ্ধ মুসল্লির চোখ আনন্দে ছলছল করে উঠলো। আর আমি অভিভূত হলাম এ যুগে একজন সৎ মানুষের দেখা পেয়ে।

তেজগাও, ঢাকা থেকে

আহ্বান

– তপন

তখন বিএসসি ইন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র ছিলাম। প্রেম করতাম আমার চেয়ে চার পাচ বছরের ছোট আমার এক আত্মীয়ার সঙ্গে। আমার ভালোবাসার মানুষটি অদ্ভুত স্বভাবের ছিল। অদ্ভুত স্বভাবের বলছি এ কারণে যে, কখনো তার আবেগ, আমার প্রতি তার ভালোবাসার তীব্রতা আমাকে আলোড়িত করতো। আবার কখনো বা তার নিস্পৃহতা আমাকে হতাশ করতো। এই নিয়ে আমার সঙ্গে তার বাদানুবাদ লেগেই থাকতো।

আমার বয়সী একটা ছেলে তার প্রেমিকার কাছ থেকে সব ব্যাপারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাড়া আশা করে। কিন্তু তার পক্ষে হয়তো আমার সকল আহ্বানে সাড়া দেয়া সম্ভব হতো না। তাই সে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রায়ই *না-বোধক* শব্দ উচ্চারণ করতো। আর আমি কখনোই কোনো না-বোধক শব্দকেই সহজে নিতে পারতাম না। যাই হোক। এসব নিয়ে এবং আরো কিছু বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আমার একবার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পথে যোগাযোগ বন্ধ ছিল বেশ কিছুদিন।

পরদিনই খুলনা রওনা হবো। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম যাবার আগে তাকে কিছু কড়া ভাষায় কথা বলে সম্পর্কের ইতি টানবো। যেই ভাবা সেই কাজ। পরদিন ব্যাগ হাতে নিয়ে দাড়িয়ে রইলাম তার কলেজ যাওয়ার পথে। এমন সময় শুরু হলো হালকা বৃষ্টি। কিছুক্ষণ দাড়িয়ে থাকার পর দেখলাম ছাতা

মাথায় আমার ভালোবাসার মানুষটি আমার দিকেই আসছে। এ সময় তাকে অসম্ভব সুন্দর লাগছিল, চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো যে তাকে কিছু অপ্রিয় কথা বলতে এসেছি। এজন্য চোখ সরিয়ে নিলাম।

আমার ভালোবাসার মানুষটি আমার পাশে আসতেই আমি এবং সে ধীরে ধীরে হাটতে শুরু করি। কিভাবে শুরু করবো তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। এদিকে বৃষ্টি ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে, বৃষ্টির ঝাপটা এসে আমার চোখেমুখে লাগছে।

সে হঠাৎ আমাকে বললো, তুমি তো বৃষ্টিতে একেবারে ভিজে যাচ্ছো। আমার ছাতার নিচে এসো।

তার এ সামান্য কথা বলার ভঙ্গিতে ছিল এক অন্য ধরনের অধিকার, অন্য রকমের ভালোবাসা, অন্য ধরনের তীব্রতা। এর কোনোটাকেই উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। ভুলে গেলাম অভিমান। সারা পথে আর একটা কথাও বলতে পারলাম না।

আমি এখন তাকে বলি অনেক কথা যার মাঝে থাকে না কোনো অভিমান, কোনো ক্ষোভ, কোনো তিক্ততা। যা থাকে তা হলো অকৃত্রিম ভালোবাসা। এখন আমাদের ভালোবাসার মাঝে কোনো শূন্যতা নেই। নেই কোনো অপূর্ণতা, নেই কোনো দূরত্ব। আমরা দুজন দুজনকে নিয়ে ভাবতেই ভালোবাসি। পরস্পরের সকল চাহিদাকে, সকল সীমাবদ্ধতাকে ভালোবাসি ।

প্রেমের সম্পর্কের সকল ধাপই আমরা অতিক্রম করছি ঐকান্তিক বিশ্বাস আর শ্রদ্ধাবোধ দিয়ে। কিন্তু হয়তো আমাদের সম্পর্কটা সেদিনই শেষ হয়ে যেতো যদি না তার *আমার ছাতার নিচে এসো* কথাটিতে জীবনের চরম সত্যকে খুজে না পেতাম, যদি সে না করতো এই আহ্বান।

খুলনা থেকে

সাক্ষী

– প্রতীতি শিরীন

আমার মায়ের একটি নীল ছাতা আছে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা ছাতাটি সব সময় মায়ের সঙ্গে থাকে। শীত–গ্রীষ্মে ছাতাটি মায়ের সোনালি দেহকে প্রখর রোদ–তাপের হাতে পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে দেয় সুশীতল ছায়া আর বর্ষাকালে। এবং প্রয়োজনের গুণকীর্তন শেষ করা যাবে না। হালকা ইলশেগুড়িতে এটি যেমন দরকার তেমনি ঘনঘোর বর্ষণেও। আকারে অত্যন্ত ছোট এই ছাতাটি আমার সাইজে ছোট মায়ের মাথার ওপর মহীরুহের মতো দাড়িয়ে তাকে তার নিচে আশ্রয় দেয়। ঠিক যেন বটবৃক্ষের একটি ছোট সংস্করণ।

মজার ব্যাপার হলো, বাচ্চাদের এই ছাতাটি আমরা কিনিনি, উপহারও পাইনি। ছাতাটি আমিই কুড়িয়ে পেয়েছিলাম গ্রীষ্মের এক পড়ন্ত বিকেলে ভিন দেশের এক শহরের একটি স্কুলের সামনে। দেশটির নাম জার্মানি এবং স্কুলটির নাম *হিলডে গার্ড ফন বিভেন।* আমি তখন কোলন শহরে অবস্থিত এ স্কুলের ক্লাস ফাইভের ছাত্রী। হলুদ বাটওয়ালা নীল ছাতাটি স্কুলের সামনে একটি থামের গায়ে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখতে পাই যেন ছাতাটি আমার জন্যই অপেক্ষমাণ। মনে হলো দেখতে সুন্দর এ ছাতাটি চরম অবহেলায় ফেলে যাওয়া। নিশ্চয়ই খামখেয়ালি কোনো ছাত্র কিংবা ভুলোমনা কোনো পথিকের কাজ। ছাতাটি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। কাঠের হাতলের মাথায় একটি ব্যাঙের মুখ কেটে বের করা। চোখের জায়গায় দুটো প্লাস্টিকের মণি। নীল কাপড়ে টেডি–বিয়ারের নকশা তোলা। সব মিলিয়ে বোঝা যায়, ছাতাটি তিন চার বছরের বাচ্চাদের মন ভোলানোর জন্য তৈরি। কিন্তু চকচকে

জিনিসটি আমার হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কালবিলম্ব না করে হারানো জিনিসটি পরম মমতায় বুকে তুলে নিলাম।
এরপর গড়িয়ে গেছে বেশ কয়টি বছর। জার্মানি এখন স্মৃতির পাতায় শুধুই ধূসর থেকে ধূসরতম হয়ে চলে, মরচে পড়া নকশা বুনে চলে। মনে হয় জার্মানি-র এই অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা আমার জীবনে কখনো ঘটেনি। পুরোটাই একটা স্বপ্ন, একটা মায়া। তারপরেও ঘরের কোণায় দাড় করা ছাতাটি দেখলেই বুঝি সবটাই ভ্রম নয়। জার্মানি যে স্বপ্নের মতোই আমার জীবনটাকে নাড়া দিয়ে গেছে তার সাক্ষী ছাতাটি নিজে। এর দিকে তাকালে এ বয়সেই নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হই।
আজ আমাদের এলাকায় মা তার ছাতাটির জন্য বিখ্যাত। মধ্যবয়সী মা আমার এ শিশু ছাতাটি নিয়ে সর্বদাই অস্থির থাকেন। দুজন দুজনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই বোধ করি বছর খানেক আগে ছাতাটি একবার হারানো গেলেও এটি এবং এর মালিকের জনপ্রিয়তার কারণে মা তার প্রিয় জিনিসটি আবারও ফিরে পেলেন। ছাতাটি আজো রয়ে গেছে।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

কোচিং

– পরমা

ক্লাস এইটে পড়ি। সামনে বৃত্তি পরীক্ষা। ছাত্রী হিসেবে ভালোই। তাই বৃত্তির কোচিং করতে দেড় মাইল হেটে স্কুলে পৌছাতে হয়।
একদিন কোচিং শেষে একা একা হেটে বাড়ি ফিরছি এমন সময় লক্ষ্য করলাম, আমার পেছনে কিছু বখাটে ছেলে আসছে। তেমন ভয় না পেয়ে আগের মতোই স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাটতে থাকি। কারণ এর আগেও এ রকম হালকা পাতলা কিছু বাতাস বয়ে গেছে আমার ওপর দিয়ে। তবে হাক-ডাক পড়ার মতো কিছু হয়নি। কিন্তু সেই দিন ঘটলো এক ভয়াবহ ঘটনা।
ছেলেগুলো আমার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে। এতে আমার দিক থেকে কোনো প্রকার সাড়া না পেয়ে আমার ছাতা ধরে টান দিয়ে একটা চিরকুট গুজে দেয় আমার বইয়ে।
ভয়ে আমার গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে রাজ্যের পানি খেলেও ভিজবে না। চিরকুটটা ফেলতে পারিনি ভয়ে যদি কিছু করে! তারা সেদিনকার মতো আমার পিছু ছেড়েছিল এবং আমি বাড়ি যেতে পেরেছিলাম। মা বাবা যদি পড়ালেখা বন্ধ করে দেন সেই ভয়ে বাড়ি গিয়ে কাউকে কিছু বলিনি।
পরের দিন যথারীতি কোচিংয়ে গেলাম এবং আসার সময় আমার পরিচিত দুটি ছেলের সঙ্গে হাটতে হাটতে রওনা হলাম বাড়ির পথে, মাঝপথে আসতেই সেই ছেলেগুলোকে দেখতে পেয়ে আবারও গলা-বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। দেখলাম অস্ত্র। এরপর আমার সঙ্গের ছেলে দুটোর সঙ্গে তাদের তুমুলভাবে বেধে যায়।
এক সময় এসব ঝগড়াঝাটি থেমে গেল। আমি আবার কোচিংয়ে গেলাম এবং বৃত্তি পরীক্ষাও দিলাম। কিন্তু বৃত্তি পেলাম না। এখনো মনে পড়ে সেই লোমহর্ষক ঘটনা।

ঠিকানাবিহীন

রটনা

– মোহাম্মদ অয়েজুল হক

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ছাতা কোথায় একত্রিত অবস্থায় দেখা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর একটু চিন্তা করলেই বলা যায়, হজের সময় আরাফাতের ময়দানে সবচেয়ে বড় ছাতার মেলা বসে। আবার ছাতার প্রকার ভেদ করলেও আসবে নানান ধরনের ছাতার কথা। ব্যাঙের এক প্রকার ছাতা আছে। বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষার জন্য আমরা এক প্রকার ছাতা ব্যবহার করি। এভাবে আরো নানান পদের ছাতা পৃথিবীতে আছে।

আমাদের গ্রামে একটি প্রেমের ছাতা ছিল। আমরা কয়েকজন বন্ধু বাশ, গোলপাতা ও পলিথিন দিয়ে বাগানের ভেতর একটা বড় ছাতা তৈরি করেছিলাম, আমাদের বন্ধু ও তার প্রেমিকার কথা-বার্তা বলার সুবিধার্থে। *প্রেমের ছাতা* বললাম এই কারণে, যে ছাতার নিচে বসে প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেম নিবেদন করে এবং যে ছাতা প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য তৈরি হয় তাকে *প্রেমের ছাতা* বলাই উচিত। এ রকম ছাতা আমরা পার্কেও দেখতে পাই।

সকাল-বিকেল-সন্ধ্যা প্রতিদিন এই তিন সময়ে ভাত যেমন আমাদের খেতেই হয় তেমনি আমার বন্ধু আকাশ আর তার প্রেমিকা নদী ভাত খাওয়ার চেয়েও জরুরি মনে করে একে অপরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তিন বেলা।

একদিনের একটা ঘটনা বলি। বাগানের ভেতর আমাদের তৈরি সেই ছাতার নিচে আমি আর আকাশ বসে গল্প করছি এবং সিগারেট খাচ্ছি। এমন সময় নদী এসে উপস্থিত। আমরা সিগারেটটা লুকাতে চেষ্টা করলাম। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে নদী কোনো কথা না বলেই চলে গেল। কিছুক্ষণ পর এক প্যাকেট গোল্ড লিফ এনে দিয়ে বললো, খাও।

আকাশ লজ্জা জড়ানো কণ্ঠে বললো, এসব কি করছো নদী।

নদী বললো, তুমি সিগারেট খাবে, আমি দেখবো।

আকাশ শেষ পর্যন্ত নদীর সামনে সিগারেট খেতে পারলো না। নদী তার মাথা ছুয়ে আকাশকে শপথ করালো যে, আর কোনোদিন সে সিগারেট খাবে না।

এ ঘটনা থেকে আকাশ ও নদীর ভালোবাসার গভীরতা অনুমান করা যায়। এভাবেই তাদের প্রেম চলতে পারতো। কিন্তু স্বার্থপর এই পৃথিবীর মানুষ সহ্য করতে পারেনি। একটি প্রেমিক-প্রেমিকার এতো বড় সাহস, একটি গভীর ভালোবাসা মূল্যায়নও করেনি তারা।

সারা গ্রাম রটে গেল আকাশ আর নদী বাগানের ভেতর কি যেন করে। পাঠক সমাজ, *কি যেন করে* এই কথাটার অর্থ হয়তো অনুমান করতে পারছেন। তাই বিস্তারিত লিখলাম না।

মান-সম্মানের ভয়ে মেয়েকে নিয়ে নদীর বাবা মা চলে গেলেন হয়তো বা চিরতরেই আকাশের নাগালের বাইরে।

আজ সেই প্রেমের ছাতার সমাধি হয়ে গেছে। সমাধির সঙ্গে মিশে আছে আকাশের পুরনো স্মৃতি আর মিথ্যা স্বপ্নগুলো।

মহেশ্বরপাশা, খুলনা থেকে

চুরি

– জিএম নুরুজ্জামান

চিনির মতো মিঠে কথায় অনেক চোরের মন গলাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রতিনিয়ত ব্যর্থতার গ্লানি আমার হৃদয়কে ভেঙে কাচের মতো গুড়ো করে দিয়েছে। তবু নিরাশ না হয়ে সে আমার বুকে পাল উড়িয়ে দিন কাটাতে থাকে। পাল ওড়ানোর আশায় এক সময় সুবাতাস বইতে থাকে নতুন এক মুখের দেখা পেয়ে।

আমাদের এলাকায় তারা সদ্য বসতি গড়েছে। স্থানীয় মহিলা কলেজের ইউনিফর্ম পরা রাস্তায় তাকে চোখে পড়ে প্রথম। অনেক পথ হেটে কলেজে যেতে হয় বলে প্রচণ্ড রোদ আড়াল করতে একটি ছাতা তার নিত্যসঙ্গী। মেয়েটি এমনিতেই সুন্দর। তার উপর ছাতার ব্যবহার তার সৌন্দর্যের বিশেষত্ব যেন আরো বেশ খানিকটা বাড়িয়ে তুলেছে। মুগ্ধ হয়ে তার যাওয়া–আসা দেখি আর মনে প্রেমের বারিধারা টগবগ করে ফুটতে থাকে। প্রতিনিয়ত তার যাবার পথে দাড়িয়ে দৃষ্টি আকর্ষণে কখনো গলা খাকারি, মাথার চুলে হাত লাগানো কিংবা কখনো মিটিমিটি হেসে যাই। কিন্তু বিধিবাম, আমার এ কৌশলের বিপরীতে আমাকে দেখলেই সে নিজেকে এমনভাবে ছাতার আড়াল করে পাশ কাটিয়ে যায় যে, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কেবল সেই ছাতার কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে থাকে। এতোদিন যে ছাতাকে তার সৌন্দর্য বাড়িয়েছে বলে মনে হতো সে ছাতাকে আজ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে হচ্ছে।

মনে মনে এ ছাতাকে আমার হৃদয়হরিণীর কাছ থেকে চিরতরে সরিয়ে দিতে নানান কৌশল এটে যাচ্ছি। কিন্তু কিছুতেই এ ছাতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে না পেরে শেষে চুরির পরিকল্পনাই করে বসলাম। তবে চুরি করতে হলেও জানা চাই, এ ছাতা কোথায়, কখন, কিভাবে থাকে তার তথ্য। পরিশেষে তথ্য সংগ্রহে আমাদের পাড়ার এক জাদরেল পিচ্চিকে গোয়েন্দা হিসেবে নিয়োগ দিলাম। সে এই বাড়ির পিচ্চিদের সঙ্গে মিশে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আমার সব তথ্য যোগাড় করে দিল।

এবার চুরির জন্য পরিকল্পনা শুরু করলাম। এক রাতে নেমে পড়লাম তা বাস্তবায়নে। প্রথমে বাড়ির অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক দিয়ে পাচিল টপকালাম। তারপর যে জানালার ধারে ছাতা রাখা থাকে সেখানে চলে এলাম। খানিক অপেক্ষা করেই দেখলাম মশার দাপটে টেকা যায় না একেবারে। মশা একেকবার হুল ফুটিয়ে তেরোটা বাজিয়ে দিচ্ছে। কষে থাপ্পড় মারলে যদি কেউ শুনে ফেলে এ জন্য আলতো থাপ্পড়ে তাড়ানোর চেষ্টা করছি। একবার জানালায় চড়ার জন্য যেই প্রস্তুতি নিয়ে বসা থেকে উঠে দাড়িয়েছি সেই মনকে সান্ত্বনা দিলাম, এসেছি প্রেমের জয়ে।

এক সময় জানালায় চড়ে হাতের নাগালে পেয়ে ছাতাটা তড়িঘড়ি করে তুলে নিতে গিয়ে সেটা জানালার সামনে রাখা টেবিলে লেগে ঠাস করে পড়ে গেল। কিন্তু তার শব্দ কারো কানে পৌছায়নি মনে হয়। কারণ শুনলে কেউ ছুটে আসতো নিশ্চয়। তাই ছাতাটা হাত বাড়িয়ে তুলতে গেলাম আর তখনি একটা হাত আমার হাত চেপে ধরে। সে সামনে এসে দাড়ালো। লজ্জায় কুকড়ে গেলাম। তবে সে তা ভ্রূক্ষেপ না করে জানালা থেকে হাত বের করে গালে প্রচণ্ড এক চড় বসালো। সে চড় খেয়ে প্রেমের প্রতি উজাড় করা সব খেই চিরতরে কেটে গেল আমার।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

নৌকাডুবি

– ইয়াসমিন সুলতানা মেরী

তখন ক্লাস নাইন–এ পড়ি। আমার স্কুল ছিল আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। বছরের অন্যান্য সময়ে হেটে বা রিকশা করে যেভাবেই হোক, স্কুলে যেতে তেমন কোনো অসুবিধা না হলেও বর্ষা মরসুমে ছিল বিরাট এক সমস্যা।

বাড়ি থেকে বের হয়ে পাচ মিনিট হাটার পরেই নৌকায় করে যেতে হতো এক ঘণ্টা। কাজেই এ এক ঘণ্টা সময়ে আমার দীর্ঘ স্কুল জীবনের নানান স্মৃতিই মনকে দোলা দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় আমার একটি দিনের কথা। ক্লাস নাইনের বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছিল তখন। এদিন ছিল আমার হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা। প্রতিদিনের মতো যথারীতি পরীক্ষা দিতে বাড়ি থেকে বের হয়েছি। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে সাধারণত যা হয় আর কি! আকাশের মন মেজাজের ভাব বোঝা মুশকিল। নৌকায় করে অর্ধেক পথ যেতে না যেতেই দমকা বাতাসসহ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

এ সময়ে পরম বন্ধু ছাতাটি আমার সঙ্গেই ছিল। বৃষ্টিতে ভিজিনি ঠিকই কিন্তু নৌকার অন্য সবাই যখন বৃষ্টিতে ভিজছে তখন আমার একা না ভিজে থাকাটা বাতাসের কাছে হয়তো বা বেমানান মনে হয়েছিল। তাই দমকা হাওয়া সহ্য করতে না পেরে চোখের নিমেষে নৌকাটি ডুবিয়ে দিল।

নৌকায় মাঝিসহ আমরা মোট দশজন ছিলাম। এর মধ্যে মেয়ে আমি একাই। তারপরেও গ্রামে বাস করার সুবাদে সাতার বেশ ভালোই জানি। কিন্তু বড় বড় ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যখন শেষ রক্ষা হচ্ছিল না ঠিক সেই সময়ে দেখি বাতাসে আমার হাতের ছাতাটি উল্টে গিয়ে পানিতে ভাসছে। কোনো রকমে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে ধরে ফেললাম। এরপর ভাসতে ভাসতে পাড়ে এসে উঠতে পেরেছিলাম।

পশ্চিম সেওতা, মানিকগঞ্জ থেকে

অফিস পাগল

– তৃপ্তি

১২ অক্টোবর ২০০০ সাল। সকাল নয়টা। আব্বা ছাতা হাতে অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। পাশ থেকে মা প্রশ্ন করছেন, কোথায় যাচ্ছো? এই রোদে না বের হলেই কি নয়? তোমার শরীরটা এমনিতেই কয়েকদিন থেকে খারাপ যাচ্ছে।

আব্বার এক উত্তর, শ্বশুরবাড়িটা একবার দেখে আসি।

আব্বা তার অফিসকে সব সময় শ্বশুরবাড়ি বলতেন। আব্বা ১৯৯৭ সালে অবসর নেয়ার পর পুরোটাই বেকার হয়ে পড়েন। আগে যখন অফিস করতেন তখন প্রতিদিন সকাল নয়টার মধ্যেই অফিসে পৌছে যেতেন। তিনি খুব সময় মেনে চলতেন। অফিসের প্রতি তার এতো দুর্বলতা ছিল যে, সকাল নয়টা বাজলে তিনি আর ঘরে থাকতে পারতেন না। জীবনে তিনি ঘরের চেয়ে তার অফিসকেই সময় দিতেন বেশি। আসলে আব্বা ছিলেন কাজপাগল মানুষ। তাই অবসর নেয়ার পরেও সকাল নয়টা বাজলেই তিনি অফিসে ছুটতেন। তিনি বুঝতেন আজ সেখানে তার কোনো দাম নেই।

কিছুদিন আগে যে স্থানে গেলে তার নিম্ন কর্মকর্তা, কর্মচারীরা তাকে সালাম জানিয়ে উঠে দাড়াতো, যেখানে তার কাজ করার আলাদা একটা ঘর ছিল, যে ঘরে প্রবেশ করতে তার কাছে অন্য যে

কারোরই অনুমতি চাইতে হতো সেখানে আজ কোনো ঘর কেন, অফিস বারান্দাতেও হয়তো বা তার বসার কোনো জায়গা নেই। তবু তিনি তার প্রিয় অফিসটা দেখার জন্য প্রতিদিন সকলে ছুটে যেতেন। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে সেই ছাতাটাই ছিল তার সঙ্গী। আমরা যদি বলতাম, আব্বা, কোথায় যাচ্ছো।

তিনি হেসে উত্তর দিতেন, শ্বশুরবাড়ি বাড়ি যাচ্ছি।

আমরা বুঝতাম তিনি কোথায় যাচ্ছেন। তাই বলতাম, সেখানে গিয়ে তোমার কি লাভ, সেখানে তো তোমার কোনো দাম নেই? শুধু শুধু এতো রোদ বা বৃষ্টির মধ্যে তুমি কষ্ট করো। তার চেয়ে বরং বাড়িতে পত্রিকা বা গল্পের বই পড়ে সময় কাটাতে পারো।

তোরা কি বুঝবি, সকাল নয়টা বাজলে যে আমার মনটা অস্থির থাকে।

আব্বা তার ছাতার খুব যত্ন নিতেন। বৃষ্টিতে যদি ছাতা ভিজতো তাহলে বৃষ্টি থেকে ফিরেই ছাতাটা শুকনা স্থানে মেলে রাখতেন এবং খুব ভালো করে শুকিয়ে তুলে রাখতেন। পারতপক্ষে বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া আমরা কেউ তার ছাতায় হাত দিতাম না। কারণ ছাতায় অন্য কারো হাত পড়লে আব্বা টের পেতেন। এবং বদমাশ, বেলাজ, বেহায়া, বেয়াদব এই জাতীয় ভাষা দিয়ে যতো রকম গালিগালাজ আছে সব তার ওপর বর্ষণ হতো।

আব্বার দিনগুলো এভাবেই কাটছিল। কিন্তু সেদিন অর্থাৎ সেই ১২ অক্টোবর বেলা ১২টায় আব্বা ঘেমে ছাতা হাতে বাড়ি ফিরলেন। ছাতাটা বন্ধ করে তার কাপড়ের আলনার এক পাশে রাখলেন। তারপর ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিলেন। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেলে আসরের নামাজের অজু করে সিড়ি দিয়ে উঠতেই সেখানে পড়ে যান। আর এখানেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সব কিছু শেষ হয়ে যায়। এভাবেই আমাদের মাথার ওপর থেকে বড় রকমের ছাতাটা সরে যায়।

আব্বার তুলে রাখা সেই ছাতা আজো আলনায় সেই অবস্থায় ঝুলছে। কাউকে সরাতে দিইনি। কারণ এটাতেই আব্বার শেষ স্পর্শ লেগে আছে। এ ছাতার মধ্য দিয়েই আব্বার স্মৃতি, স্পর্শ এবং তার জীবনের অস্তিত্ব খুজে ফিরি।

ধাপসাগরপাড়া, রংপুর থেকে

জীবিকা

– ইকবাল বাহার খান

ছোটবেলা থেকে ছাতাকে সঙ্গে নিতে বড্ড ভয় পাই। বাড়ি থেকে যে কয়টা ছাতা নিয়ে পথে বেরিয়েছি সে ছাতা আর বাড়ি ফিরিয়ে আনিনি। ছাতা হারানোর জন্য মায়ের অজস্র বকা হজম করেছি। ফলে ছাতার সঙ্গে আমার একটি দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

বর্ষার সময় মাথার ওপর বই দিয়ে অথবা কচু গাছের পাতা মাথায় দিয়ে বাড়ি ফিরতাম। আকাশে মেঘ দেখে যখন বাইরে বের হতাম তখন মা বলতেন, খোকা, ছাতা নিয়ে যা, বৃষ্টিতে যে ভিজবি।

যদিও জানি বৃষ্টিতে ভিজবো তবুও ছাতার কাছে যেতাম না।

ঢাকা থেকে বাড়ি যাচ্ছি। তখন বর্ষাকাল। আমার বাড়ি পদ্মা-যমুনার সঙ্গমস্থলের ওপারে। অর্থাৎ রাজবাড়ীতে। বাস থেকে নেমে বিশাল প্রমত্তা পদ্মা পাড়ি দিতে হয়। যখন লঞ্চে বসে আছি তখন ঝুপ করে নামলো বর্ষার অবিরাম ধারা। লঞ্চ টার্মিনাল থেকে বাসস্ট্যান্ড কিছুটা দূরে। হেটে যেতে চার পাচ

মিনিট লাগে। ইতিমধ্যে যাত্রীরা যার যার মতো রওনা দিয়েছে। আমি এখন ছোট নই যে, ভিজতে ভিজতে দৌড়াবো। সুতরাং ঠায় দাড়িয়ে রইলাম।

বুঝতে পারছি, বাস আমাকে ছেড়ে চলে যাবে। ইতিমধ্যে ছোট একটা ছেলে পরনে শুধু হাফপ্যান্ট, মাথায় একটা বড় ছাতা যার জায়গায় জায়গায় ছেড়া, দাড়িয়ে বলছে, স্যার যাবেন, মাত্র পাচ টাকা।

আর দেরি না তার ছাতার তলায় আশ্রয় নিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্কুলে যাও না? কোন ক্লাসে পড়?

সে বললো, স্কুলে যাই। তবে যেদিন বৃষ্টি হয় সেদিন স্কুলে না গিয়ে এখানে এসে মানুষ পার করি। যা আয় হয় তা দিয়ে মা-বাবার সাহায্য করি আবার আপনাগো বৃষ্টি থেকে রক্ষা করি।

আজ কতো হয়েছে?

বেশি না, পঞ্চাশ টাকার মতো।

তার মতো অনেককে দেখলাম এভাবে ছাতা দিয়ে মানুষ পার করতে। এর বিনিময়ে তারা কিছু পারিশ্রমিক পায়। তার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাসস্ট্যান্ড চলে এসেছি। বাসে সব যাত্রী উঠেছে। শুধু আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

সেই ছেলেকে সাত টাকা দিয়ে বাসে উঠে বসলাম। তখনো প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, সে আবার অন্য যাত্রীর জন্য ছুটে চলেছে।

একটা ছাতা যে শুধু মানুষকে রোদ-বৃষ্টি থেকে রক্ষা তা নয়, বরং এটা মানুষের জীবন ধারণের অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম।

কাওরানবাজার, ঢাকা থেকে

সম্পর্ক

– আফসানা কিশোয়ার

হাস্যকর-ই বটে! আমার বাসার সদস্যরা তো অবশ্যই, শ্বশুরবাড়ির লোকজনও মুচকি হেসেছে জিনিসটা দেখে। দেশের বাইরে যাবার সময়ও যখন যত্ন করে ব্যাগে ভরলাম একই বস্তু তখন হাজব্যান্ড-এর হাসি অট্টহাস্যে রূপ নিয়েছে।

বাবা, তোমাকে যে মনে পড়ে বড় বেশি তাই তোমার দেয়া উপহার চোখের সামনে যত্নে রাখি। ভোলা কি যায়? সেই যে আমি ষষ্ঠবারের মতো প্রেমিক বদলালাম। হঠাৎ বাবার দায়িত্বে সজাগ হয়ে তুমি দিলে হাড় মাংস একাকার করা মার। তারপর বাক্য বিনিময় বন্ধ হলো তোমার সঙ্গে। বন্ধ করলাম টাকা পয়সা নেয়া তোমার কাছ থেকে। একই বাসায় থেকেও তোমার সঙ্গে সম্পর্ক হলো দূর পরবাসের। কি যে কষ্ট বাবা! সেই সময়টা তোমার ঔদাসীন্য বুকের জ্বালা বাড়িয়েই চললো। কিন্তু নীরবে একদিন জানিয়ে দিলে তুমি সবই দেখো, প্রকাশ করো কম।

বাবা, বড় বেশি কষ্ট লাগে, আজো প্রতি বর্ষার সেই দিনটাতে ঝুম বৃষ্টির মাঝে হাটছি। বাসায় একটা ফোল্ডিং ছাতাও নেই। তাই এভাবেই কলেজের উদ্দেশে বের হয়েছি, রিকশার পাত্তা নেই। তোমার গাড়ি আমায় ক্রস করলো। তুমি একবার পেছনে এসে বললেও না, মণি, গাড়িতে ওঠ। কলেজ থেকে বাসায় ফিরলাম ভীষণ জ্বর নিয়ে। পড়ার টেবিলে ব্যাগ রাখতে গিয়ে দেখলাম, ধূসর রঙের ছোট

ছাতাটা। নতুন। টিপ দিলে খোলে আবার সুইচ টিপলে বন্ধও হয়। আমার সব পার্সেই স্বচ্ছন্দে এটে যায়, সঙ্গে ছোট একটা চিরকুট –

মণি, বৃষ্টিতে ভেজা আর নয়

বাবা–র দেয়া ছাতা সেই কথা কয়

দেখলাম, জানলাম, বুঝলাম যে, বাবা, তুমি আমার প্রতি কতোটা লক্ষ্য রাখো।

তাই সব অভিমান ভুলে আবার তোমারই বুকে ঝাপ দিলাম। এই ছোট ধূসর অটো ছাতাটা হলো পিতা–কন্যার সম্পর্কের নবসেতু।

বাবা, তুমি-ই বলো, এ উপহার কিভাবে সঙ্গে না রাখি? যা কোনোদিন বলতে পারিনি তা সোজাসুজি আজ বলি, বাবা, তোমায় খুব ভালোবাসি। তোমার স্নেহের ছাতার তলে যেন ফিরে আসি।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

তিনটি বোতাম

– জাবেদ

দিনটি ছিল ৩ জুন ২০০০ সাল। এসএসসি ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। স্কুলে যাওয়ার তেমন একটা সুযোগ হতো না। হঠাৎ সমবয়সী চাচাতো ভাই এসকান্দারের সঙ্গে জরুরি কাজে স্কুলে গেলাম। এই সুযোগে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তখন ক্লাস এইটে পড়ুয়া ছাত্রী প্রেমিকা লিজার সঙ্গে দেখা করলাম, কথা বললাম।

সে সময় খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি যদিও ছাতা নিয়েছিলাম তবুও চাচাতো ভাইকে দিয়ে দিলাম। প্ল্যান ছিল এতো সুন্দর বৃষ্টিতে একটু ভিজে নেবো। আমার সঙ্গে কথা শেষ করে তার বান্ধবী কলিকে নিয়ে স্কুলের গেট পার হয়ে কিছুদূর গিয়ে আমার জন্য সে অপেক্ষা করছিল। আমি যখন বৃষ্টিতে ভিজে তাদের কাছে গেলাম তখন খুব কাপছিলাম।

লিজা বললো, তুমি এভাবে ভিজতে থাকলে তোমার অসুখ করবে না?

অভিমান করে বললাম, অসুখ করলে আমার করবে, তোমার কি?

সে বললো, তাহলে আমিও ভিজতে বাধ্য হবো। তার চেয়ে ভালো, আমার ছাতাতে চলে এসো, দুইজন এক সঙ্গে যাই।

আমি মহাখুশি। মনে মনে বললাম, এতোক্ষণ এ কথারই অপেক্ষায় ছিলাম। আসার সময় হঠাৎ চোখ পড়লো তার বোতামওয়ালা ড্রেসের দিকে। তখন কলি আমাদের সুযোগ দিয়ে প্রায় দশ হাত আগে হাটছিল।

বললাম, লিজা, একটা প্রস্তাব করবো যদি কিছু মনে না করো।

সে বললো, তোমাকে ভুলে যাওয়ার প্রস্তাব ছাড়া তোমার যা ইচ্ছা প্রস্তাব করতে পারো। তোমার প্রস্তাবে আমি প্রস্তুত।

আমি বলে ফেললাম, তোমার তিনটা বোতাম খুলে আমাকে একটু দেখাবে?

সে লজ্জায় মুখে ওড়না দিয়ে বললো, আমাকে এই প্রস্তাব করতে তোমার একটুও লজ্জা করলো না?

বললাম, এতো কিছু বুঝি না, আমার ভালোবাসাকে আমি সব সময় যা বলি তা খোলাখুলি বলি। যখন তুমিই আপত্তি করেছো তখন আমি চললাম।

এ কথা বলে ছাতা থেকে বের হয়ে দুই এক কদম যেতে না যেতেই পেছন থেকে আমার হাত ধরে সে বললো, আমি কি তোমার প্রস্তাবে না করেছিলাম? বৃষ্টিতে না ভিজে ছাতায় এসো। ছাতায় এসে তোমার স্বপ্নের পৃথিবীটা দেখে যাও।

লিজা তার ড্রেসের গলার প্রথম বোতাম যখন খুললো তখন আমার গায়ের সব লোমই খাড়া হতে লাগলো। যখন দ্বিতীয় বোতাম খুললো তখনই স্পষ্ট দেখতে পেলাম মেয়েদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থানটি। সে তৃতীয় বোতামে যখন হাত দিল তখন তার হাতটা ধরে ফেললাম। কারণ যখনই সে দ্বিতীয় বোতাম খুললো তখনই আমার দেহে কেন জানি বিদ্যুৎ চমকাতে থাকলো। তার বোতামগুলো লাগিয়ে দিয়ে বললাম, তৃতীয় বোতাম আর খুলতে হবে না। এতেই যথেষ্ট। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, তুমি আমাকে ভালোবাসো। সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো। এ কথা বলে তার চিবুকে হাত দিয়ে তার রাঙা ঠোটে একটা গভীর চুমু খেলাম।

কলি দেখেও না দেখার ভান করে হাটতে লাগলো। আমরা দুজনই তখন ছাতা ও বৃষ্টিকে ধন্যবাদ জানালাম। কারণ এ বৃষ্টি আর ছাতার কারণেই আমরা সেদিন এতো পাশাপাশি হয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছিলাম।

মুনিরনগর, চট্টগ্রাম থেকে

অমানুষ

– সাজিয়া

ঘনিষ্ঠ বান্ধবী পারভীন হঠাৎ করে অফার করলো কুমিল্লা বেড়াতে যাবার জন্য। তার বাবা তখন সেখানকার ডিসি ছিলেন। এইচএসসি পরীক্ষা শেষ। তাই রাজি হয়ে গেলাম। এক রাতের মধ্যে সব গুছিয়ে আমি এবং আরেক বান্ধবী নীপা কুমিল্লা বেড়াতে গেলাম। সেখানে অনেক দর্শনীয় জায়গা আছে।

জুলাই মাস পুরো বৃষ্টির সময়। তাই এখানে বেড়াতে এসে কোনো মজা পাচ্ছিলাম না। সারাটা দিন ঘরে বসে কাটাতে হচ্ছে, কোথাও বের হতে পারছি না।

আমাদের এই অবস্থা দেখে বান্ধবীর বড় বোন বললেন, যেভাবে হোক তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

তার কথা শুনে এবং পরের দিন আবহাওয়া দেখে মনে হলো ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। তাই সকালে প্রচুর রোদ দেখে গাড়ি নিয়ে আমরা তিন বান্ধবী আর আপু বের হলাম এবং যতো দর্শনীয় জায়গা ছিল সব দেখছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মারা যাওয়া বিদেশিদের কবরস্থান, কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট, বার্ড, ময়নামতি জাদুঘর, শালবন বিহার, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি আরো অনেক জায়গা। তবে বিপদে পড়লাম কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ের ওপর হিন্দুদের মন্দির দেখতে গিয়ে।

আপু বললেন, খুব সুন্দর মন্দির।

আগ্রহ নিয়ে খুব কষ্ট করে উপরে উঠে আমরা চারজন মন্দির দেখতে গেলাম। পূজো হচ্ছে এ জন্য ভেতরে ঢুকতে দেবে না। এমন সময় আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামলো। তারা বাড়ির ভেতর আমাদের ঢুকতে দেবে না। কারণ আমরা মুসলিম। এদিকে সঙ্গে ছাতা নেই এবং গাড়ি অনেক নিচে।

কোথায় আশ্রয় নেবো। পাশে অনেক বড় গাছ ছিল। সেখানে দাড়ালাম। এতো বৃষ্টি হচ্ছিল যে, আমরা সবাই সেখানে বৃষ্টিতে গোসল করে ফেললাম।

বৃষ্টি থামলে অনেক কষ্টে নিচে নেমেছি। কেননা বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়ে গেছে। হাটতেও কষ্ট।

যাহোক, বাসায় পৌছালাম এবং নীপার সেদিনই জ্বর হলো। নীপা সুস্থ হলে প্রায় ১৫ দিন পর কুমিল্লা থেকে ঢাকায় এলাম। তবে সেদিনের ছাতাবিহীন সেই ঘটনার কথা আমৃত্যু মনে থাকবে। সবচেয়ে বেশি কষ্ট লাগে মন্দিরের সেই মানুষের মনুষ্যত্ববোধের কথা ভেবে!

ভজহরি সাহা স্ট্রট, ঢাকা থেকে

বুদ্ধিমান

– সিদ্দিক লিটন

ছাতা নিয়ে আমার ছোটবেলার একটা মজার ঘটনা আছে। আমাদের কৃষি নির্ভর পরিবার। ফাল্গুন চৈত্র মাস কৃষি নির্ভর পরিবারগুলোর জন্য একটু সঙ্কটের। গোলার ধান এ সময় যেমন শেষ হয়ে আসে তেমনি গরুর খড়ও। মাঠে ইরি ধানের শীষ বের হয়। গমের জমি থেকে গম কাটা হয়। কিছু পরিবার রুটি খেয়ে জীবন ধারণ করে।

খড় কমে আসে বলে দুই বেলা গমের মাঠে গরু চরায় সবাই। এমনি সময়ে এক ছুটির দিনে সকালে পড়া থেকে উঠলে আব্বা বললেন দুপুর পর্যন্ত গরুগুলো চরিয়ে নিতে আসতে। ছাতা নিতে না চাইলেও আব্বা প্রায় জোর করেই দিয়ে দিলেন। বললেন, খা–খা রোদ, ছোট মানুষ, শরীর অসুখ করবে**...**।

অগত্যা ছাতাটা নিয়েই রওনা হলাম। মাঠে পৌছে মার্বল, লড়ি কাচ্চা এসব খেলায় মগ্ন হয়ে গেলাম। সেদিন আবার গরুগুলো খাওয়া বাদ দিয়ে খুব হাটাহাটি করছিল। এতে আমাকে খেলা বাদ রেখে বার বার গরু ফিরিয়ে আনতে যেতে হচ্ছিল। রাগও হচ্ছিল খুব। মনে হচ্ছিল দড়ি এনে বেধে রাখি। এক সময় বিরক্ত হয়ে কাঠের ছাতার যে অংশটা ঝোলানোর জন্য ব্যবহৃত হয় সেখানে গরুর পেছনের পায়ে লাগিয়ে দিলাম জোরে টান। এতে ছাতার বাটের আংটার মতো অংশ থেকে ভেঙে গেল। পড়লাম মহাচিন্তায়। বকা খাওয়ার ভয়ে বুদ্ধি একটা বের করে ফেললাম। বাড়ির কাছের এক ইরির জমি থেকে কাদামাটি দিয়ে ভাঙা অংশ সঙ্গে জোড়া লাগালাম। ছাতা নির্দিষ্ট জায়গায় না ঝুলিয়ে ঘরের বেড়ার সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখলাম।

বিকেলে আব্বা ছাতা হাতে নিতেই দুই অংশ পৃথক হয়ে গেল। সর্বশেষ ছাতা ব্যবহারকারী হিসেবে আমাকে তলব করা হলো। নির্ভুল বর্ণনা দিলাম। বকা দেয়ার বদলে আমাকে অবাক করে দিয়ে আব্বা হাসতে শুরু করলেন। মাকে ডেকে বললেন, দেখো, তোমার ছেলের মাথায় কতো বুদ্ধি।

সেদিন আব্বা আমার বুদ্ধির প্রশংসা করে কচি মনে এ ধারণা দিয়েছিলেন যে, বুদ্ধিতে আমি আর পাচজনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। অনেক পরে একদিন রাতে খাওয়ার সময় আব্বার কথায় বুঝেছিলাম যে, আমার বোকামিতে আব্বা সেদিন আমাকে উপহাস করে বুদ্ধিমান বানিয়েছিলেন।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

লজ্জা নিবারক

– অরণ্য

এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। বসেছিলাম গলির পাশের হোটেলটার সামনে। বৃষ্টির তোড় ধীরে ধীরে শুধুই বাড়ছিল। হঠাৎ রাস্তায় সুমীআপার আবির্ভাব। ছাতা মাথায় বাসায় ফিরছেন। আমাকে দেখেই হেসে বললেন, চলে এসো।

এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকলাম আপার ছাতার নিচে। সুমীআপা আমাদের এলাকার অনেক তরুণের দীর্ঘশ্বাস। বয়সে ছোট বলে আমাকে খুব আদর করতেন। মাঝে মাঝে এটা–সেটা করে দিতে বলতেন আর আমিও আপার আদেশ শিরোধার্য মানতাম।

তুমি তো ভিজে যাচ্ছো। আপা আরো কাছে ঘেষলেন বৃষ্টির ছাট থেকে আমাকে বাচাতে।

দাড়াও, আমি বাসায় পৌছে তোমাকে ছাতাটা দেবো। কিন্তু বৃষ্টির তোড় আরো বেড়ে যাওয়ায় আমাকে আপা বললেন, একটু বসে যাও।

ওনার সঙ্গে রুমে ঢুকলাম। ছাতাটাও একপাশে রাখলেন পানি ঝরার জন্য। একটা তোয়ালে এনে আপা মাথা, শরীর মুছছেন। আমি যে সামনে আছি তা কোনো খেয়ালই নেই। আমিও অপলক তাকিয়ে রইলাম তার শরীরের সঙ্গে লেপটে যাওয়া পোশাকের দিকে। এতোক্ষণ লক্ষ্য করিনি। আপার শরীরের উত্তাল ঢেউয়ের আভাস আমার চোখের সামনে উকি দিচ্ছে।

হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন আমার অবাক দৃষ্টি। রহস্যের হাসি হাসলেন।

এই, বৃষ্টি এসে সব ভিজিয়ে দিচ্ছে বলে তিনি তাড়াতাড়ি রুমের দরজা আটকে দিলেন।

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ বাসায় নেই আপা?

না, এ জন্যই তো আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হলো। কেন, ভয় করছে বুঝি?

কেমন যেন অচেনা হয়ে যান তিনি। আমার মাথা ফাকা লাগছে। শরীরে অদ্ভুত একটা শিহরণ টের পাচ্ছি। আমার সামনে এসে তোয়ালে দিয়ে আমার মাথা মুছে দিতে লাগলেন আপা।

অনুভব করলাম নিজের দিকে আমাকে টানছেন তিনি। শরীরের ভেতর অন্য একটা শরীরের জেগে ওঠা অনুভব করলাম এই প্রথম। আমার ঠোট দুটো পুড়তে লাগলো আপার ঠোটের গরমে। যন্ত্রচালিতের মতো মিশে গেলাম ওনার শরীরে। আপার শরীরের সুগন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। এই প্রথম জানলাম, প্রতিটি নারীরই নিজস্ব একটি গন্ধ আছে। প্রতি নিঃশ্বাসে টানতে লাগলাম আপার শরীরের সুগন্ধ। বুকের নরম জমিনে ডুবে গেলাম। আমার হাত সচল হয়ে গেল আপার পোশাকের অভ্যন্তরে। মুক্ত করতে চাইলাম তার অপার দুই সৌন্দর্য ভাণ্ডারকে।

এভাবে না। ফিশ ফিশ করে বললেন তিনি। আমার হাত পৌছে দিলেন মসৃণ পিঠের মধ্যভাগে যেখানে রয়েছে সৌন্দর্য ভাণ্ডারের চাবি।

আমার হাত পাগল হয়ে উঠলো। আমাকে তিনি পিষে ফেলতে লাগলেন তার শরীরে। ঠক ঠক করে দরজায় কড়া নড়ে উঠলো অসময়ে। মনে হলো একটা বজ্রপাত হলো ঘরে। ছিটকে সরে গেলাম। ভয়ার্ত চোখে চাইলাম আপার দিকে।

আপা চারদিকে তাকিয়ে বললেন, যাও এই ছাতার আড়ালে বসে থাকো।

এক লাফে পৌছে গেলাম ঘরের কোণায় রাখা ছাতার আড়ালে। তবু ভয়, আমার শরীর ঢাকবে তো ছাতার আড়ালে!

তুই কখন এসেছিস? কার যেন গলার আওয়াজ পেলাম।

এই তো। আপা জবাব দিলেন।

এভাবেই সেদিন আপার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে আর ছাতার কল্যাণে বেচে গেলাম। যে ছাতা বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার কথা সে ছাতা আমাদের রক্ষা করলো লজ্জার হাত থেকে।

এমএম আলী রোড, চট্টগ্রাম থেকে

জামায়াতি মামা

– মাহবুবুর রহমান ভূইয়া মনজু

আমাদের জামায়াতি মামার কথা বলছি। নানা নানু আমার জন্মের বহুকাল আগেই স্বর্গবাসী হয়েছেন। নানা নানুর দাম্পত্য জীবনের অমূল্য সম্পদ আমার মা এবং তার একমাত্র ভাই একজন। মামাকে যখন থেকে বুঝতে শিখলাম তখন থেকে দেখছি মামা পরহেজগার। পাচ ওয়াক্ত নামাজ মামা জামায়াতে পড়বেন। এর বাইরের পৃথিবী, বিশেষ করে সাংস্কৃতিক পৃথিবী মামার চক্ষুশূল।

মামা নিজের ছেলেমেয়েদের সেভাবে গড়তে চেয়েছেন আর আমাদের প্রায় বলতেন নাটক, সিনেমা, থিয়েটার এগুলো নাজায়েজ। এগুলোতে কেউ যাবি না। এ থেকে তিনি আমাদের কাছে *জামায়াতি মামা* নামে পরিচিত হন। অবশ্য ওনার এ সম্বোধন সম্পর্কে তিনি জানেন না। কারণ জানলে আমাদের কঠিন শাস্তি হবে।

মামা যে সিনেমা নাটক দেখেন না এটাই স্বাভাবিক। তাই আমাদের এসবে যেতে হলে খুব সন্তর্পণে আর সতর্কতার সঙ্গে যেতে হতো। কিন্তু মামা যে মুখের কথা নিজেই বিশ্বাস করতেন না তার প্রমাণ পেলাম একদিন এবং সেদিন কোনোমতে ছাতার কল্যাণে নিজেও বাচলাম মামার চোখ থেকে এবং মামা বাচলেন ইজ্জত হারানোর ঝুকি থেকে।

১৯৮৭ সালের ঘটনা। বৃষ্টিভেজা দিন, মেঘলা আকাশ, আমরা তিন বন্ধু সদ্য ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল পেয়ে ছবি দেখতে গেলাম ফেনী শহরের নামকরা ছবিঘর *সুরতমহল* হলে। তিন ঘণ্টার বস্তাপচা ছায়াছবি দেখে বের হচ্ছিলাম। আমরা যে গেট দিয়ে বের হচ্ছি তার উল্টো এবং মুখোমুখি গেট দিয়ে দেখি আমাদের সেই জামায়াতি মামাও বের হচ্ছেন। অবশ্য খেয়ালটা আমি প্রথম করি। কিন্তু মামার একদম খেয়াল নেই। হয়তো বা দৃশ্যের আবহ মামার চোখে–মুখে তখন। কি করি ভেবে পেলাম না। দেখি আমার পেছনে এক দর্শক হাতে ছাতা নিয়ে বের হচ্ছেন।

যেই ভাবা সেই কাজ। ছো মেরে সেই দর্শকের হাতের ছাতটা নিয়ে মাথার ওপর দিয়ে বিপরীত দিকে ভো দৌড়। এদিকে আমার দুই বন্ধুর খেয়াল নেই। একটু দূরে গিয়ে বন্ধুকে দিলাম ডাক। হাতের ইশারায় তাদের দেখালাম। না, মামা নেই। তবে?

তাদের একজনকে বলতেই সে বললো, দুর! কি দেখতে কি দেখেছিস।

পরে তাদের একজন রিকশা স্ট্যান্ডে গিয়ে ঠিকই মামাকে দেখলো। মামাও ছাতার কবলে চেহারা ঢেকে দাড়িয়ে আছেন।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে ভাইবোন সবাইকে ঘটনা বললে সবারই সে কি হাসি! মাকে ঘটনা বলতেই মা বললেন, আল্লাহ সবারই ইজ্জত বাচালো। পরে খেয়াল করতাম মামা আর কখনো নাটক সিনেমাকে

খারাপ বলতেন না। আজ যখন এ ঘটনা লিখছি তখন সে মামা আমাদের ছেড়ে পরপারের অধিবাসী। কামনা করছি, জামায়াতি মামা পরপারে ভালো থাকুন।

শান্তিনগর চৌরাস্তা, ঢাকা থেকে

কারারক্ষী

-- মোহাম্মদ ওমর ফারুক আলী

জেলখানায় ছাতা অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। কারা অভ্যন্তরে বন্দীদের নিরাপত্তা প্রহরার দায়িত্বে কর্মরত কারারক্ষীদের জন্য কোনো রক্ষী ছাউনি নেই। সরকারিভাবে পোশাক পরিচ্ছদের পাশাপাশি ছাতা দেয়ার বিধান থাকলেও কার্যত তা অচল। তাই নিজের টাকায় ছাতা কিনে রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে পালন করতে হয় নির্মম দায়িত্ব।

কারা অভ্যন্তরে বন্দীদের নিরাপত্তা প্রহরাকালে প্রাচীরের পাশে কারারক্ষীর সার্বক্ষণিক দাড়িয়ে থাকতে হয়, কেউ বসতে পারে না। যদিও বসার কোনো ব্যবস্থা নেই তবুও কেউ কেউ ক্লান্তি দূর করতে ইটের ওপর বসে। কিন্তু ক্লান্তি তাদের ক্ষমা করে না। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত হাবিলদার, সুবেদার কিংবা ডেপুটি জেলার যদি কাউকে বসে থাকতে দেখে তাহলে আর রক্ষা নেই, সাসপেন্ড অথবা দৈহিক শাস্তি অনিবার্য। যে কারারক্ষী নিজেকেই রক্ষা করতে পারে না সে কিভাবে কারাগার রক্ষা করবে? রক্তে মাংসে গড়া মানুষ কি ঘোড়ার মতো সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা দাড়িয়ে থাকতে পারে! এরপরও দাড়িয়ে থাকতে হয়। চাকরি রক্ষা করতে হবে তো!

কারারক্ষীদের দায়িত্ব এখন আর বন্দী প্রহরাতে সীমাবদ্ধ নেই। কারা কর্মকর্তাদের গরু, হাস-মুরগির খামার, দৈনন্দিন রান্না, এমনকি পারিবারিক কাপড় ধোয়ারও অলিখিত দায়িত্ব কারারক্ষীদের। প্রতি বছর একটি করে ছাতা দেয়ার বিধান থাকলেও কারারক্ষীরা কখনো ছাতা পায়নি। ছাতার জন্য বরাদ্দকৃত টাকা যে কোথায় যায় তা কেউ জানে না।

রংপুর থেকে

দাদাভাই

- সেলিনা আখতার

১৯৬৯ সালের কথা। আন্দোলনের উত্তাল সময়। দেখতাম বড়রা আন্দোলনের কথা বলছেন। কিন্তু বয়স কম থাকায় বুঝতাম না তেমন। সেই সময়ে একদিন হঠাৎ আমাদের দাদা এলেন গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায়। বলে রাখা ভালো যে, বাবার সরকারি চাকরির কারণে আমরা তখন এখানেই থাকছি। আমি স্কুলের প্রাথমিক পর্যায়ে। দাদা এলেন আর আমরা ছোটরা বেজায় খুশি।

আমাদের প্রিয় দাদাভাই অসুস্থ। চিকিৎসায় ধরা পড়লো ক্যানসার। ক্যানসার কি ধরনের অসুখ বোঝার মতো বয়স তখন আমার হয়নি। দেখতাম বাবা এবং চাচ্চুরা দাদাভাইকে নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মাঝে মাঝে দাদাভাই-এর কাছে গিয়ে বসতাম, বিভিন্ন গল্প করতাম। তিনি কতো কথাই যে বলতেন! মা এসে বলতেন দাদাভাইকে যেন বিরক্ত না করি। কিন্তু আমার মনে হতো, দাদাভাই যেন আমাকে পছন্দ করতেন।

দাদাভাইকে ওষুধ খাওনোর দায়িত্ব পড়লো আমার ওপর। সঠিক সময়ে ওষুধ খাওয়াতে হতো তাকে। তাছাড়া বাইরে বেড়ানোর সময়ে আমি ছিলাম তার একমাত্র সঙ্গী।

আরেকটি কঠিন দায়িত্ব ছিল আমার। প্রতিদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে তাকে সেই দিনের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিশেষ খবরগুলো পড়ে শোনাতে হতো। মাঝে মাঝে বলতেন, নীলিমা স্যান্নাল–এর মতো করে পড়ো। নীলিমা স্যান্নাল সেই সময়ের আকাশবাণীর সংবাদ পাঠিকা।

বলতাম, আপনি নিজে কেন পড়েন না দাদাভাই? আপনি দেখতে পান তো।

তোমার মুখে শুনতেই বেশি ভালো লাগে যে বুবু।

একদিন স্কুল থেকে ফেরার সময় পথে ঝম ঝম করে বৃষ্টি। সে কি বৃষ্টি। বাসায় পৌছাতে ভিজে একেবারে চুপসে গেছি।

দাদাভাই দেখেই হা হা করে উঠে বললেন, তোমার ছাতা নেই বুবু?

বড় ছাতা আছে।

পরের দিন স্কুল থেকে এসে আমার চোখ একেবারে ছানাবড়া। আমার পড়ার টেবিলে ছোট্ট একটা রঙিন ছাতা মেলে দাড় করানো। খুশিতে আমার ছোট্ট মনটা উদ্বেলিত হয়ে উঠলো যা এখনো যেন অনুভব করতে পারি।

এর মাঝে কখন যে এক বছর চলে গেছে। শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। দাদাভাই বলতেন, দ্যাখো, আমি বৃটিশ আমল দেখেছি, পাকিস্তানও দেখলাম। হয়তো বাংলাদেশও দেখে যেতে পারবো।

কিন্তু তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দেখে যেতে পারেননি। তার স্নেহের স্মৃতিটুকু শুধু আমার কাছে রয়ে গেল সেই লাল, নীল, শাদা ডোরাকাটা ছাতাটি।

এর বেশ কিছুদিন পর বাসাবদলের সময় সেটি কোথায় যে আত্মগোপন করলো! অনেক খুজেছি। পাইনি। এখন এই পরিণত বয়সেও মনে জেগে রয়েছে দাদাভাই–এর সেই ছোট্ট মধুর স্মৃতি।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

লজিং মাস্টার

– নাজরানা লোপা

ছোট ভাইবোনদের লজিং মাস্টার আমার ক্লাসমেট। খুব মেধাবী। একই কলেজে পড়ি। কিন্তু বাসায় আমাদের খুব কমই দেখা হয়। সারাদিন নিজের ঘরে মুখ গুজে থাকে। যেদিন ক্লাসে যেতাম না শুধু সেদিনই সন্ধ্যায় পড়া দেখাতে যেতাম। ভালো ছাত্র হিসেবে শ্রদ্ধাবোধ ছিল। ধীরে ধীরে ভালোলাগা শুরু হলো। সাব্বিরও বুঝতে পারতো না তা নয়। কিন্তু না বোঝার ভান করতো। রোদ বৃষ্টিতে ছাতা ছাড়াই কলেজে যেতো। অর্থাভাবে ছাতা কিনতো না।

সেদিন ছিল ক্লাস টেস্ট। মুষলধারে বৃষ্টি। দেখছি ছটফট করছে ক্লাসে যাবার জন্য। ছাতা নিয়ে কলেজে যাওয়ার সময় বাবাকে বললাম, বাবা, আজ ক্লাস টেস্ট। কলেজে না গেলেই নয়। বাসায় একটি মাত্রই ছাতা আছে। সাব্বিরভাইকে কি আমার ছাতায় নিয়ে যাবো?

বাবা অনুমতি দিলেন। কারণ আমরা দুজনেই ভালো ছাত্রছাত্রী। অনেক কষ্টে দুইজনে মাথা বাচিয়ে ভিজে ক্লাসে পৌছালাম। ক্লাস টেস্ট শেষ করে অপেক্ষা করছি। কিছুক্ষণ পর দেখি একা বাসায় চলে যাচ্ছে। পেছন থেকে ডাক দিলাম।

সে বললো, এখন বৃষ্টি নেই, ছাতার দরকার নেই। রাগ করে ভাবলাম আর কোনোদিন ছাতার নিচে আনবো না। পরের দিন একা চলে গেলাম কলেজে। দেখি ভিজে একাকার হয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে।

পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরে আসার পথে সাব্বির বললো, সত্যিই তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। তুমিই আমার ভালোবাসার ছাতা।

মেধাবী ছাত্র বলে আমাদের ভালোবাসা সবাই মেনে নিল। পড়াশোনা শেষ করে সে একটা ভালো সরকারি চাকরি পেল। আমরা ছোট্ট একটা বাসা পেলাম। সেখানে দুজনের ভালো মতোই কাটছিল। আমাদের তিন তলায় থাকতো নীলা ও তার মা। নীলা এবং সাব্বির একই অফিসে চাকরি করতো। দুই বাড়ির মধ্যে এমন আন্তরিকতা ছিল যে, কে কার বাড়ির তা পার্থক্য করা যেতো না। মাঝে মাঝে লক্ষ্য করতাম তারা যেন কেমন হয়ে গিয়েছে। ঠিক সময় বাসায় আসে না। সাব্বির যেন দূরে সরে যাচ্ছে। সব সময়ই খাবার নিয়ে অপেক্ষা করি। এক সঙ্গে আর খাওয়া হয় না।

একদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। জানালার পাশে দাড়িয়ে অপেক্ষা করছি। দেখি দুজনে একই ছাতার নিচে জড়াজড়ি করে বাসায় ফিরছে যাতে কেউ বৃষ্টিতে না ভেজে। এমন সময় নীলার মা এসে বললেন, বৌমা, নীলা তো অফিসে ছাতা নিয়ে যায়নি। অনেকক্ষণ তো হলো এখনো যে বাসায় আসছে না।

বললাম, ভাববেন না খালাম্মা। তারা এখনি চলে আসবে। ছাতা নেয়নি তো কি হয়েছে? নীলার মাথায় এখন শক্ত ছাতা যা আমার মাথায়ও নেই।

গাজীপুর থেকে

বিদ্যুৎ

– ফাহিম চৌধুরী

তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। একদিন স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছি। হঠাৎ প্রচণ্ড বৃষ্টি নামলো। অগত্যা কি আর করা! হাটার গতি বাড়িয়ে দিলাম।

আমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে দেখে আমার সহপাঠিনী জলি বললো, এই, তুমি ভিজে যাচ্ছো তো, অসুখ করবে। তুমি আমার ছাতার নিচে এসো।

একটু ইতস্তত করে অবশেষে তার ছাতার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। দুইজনে এক ছাতার নিচে পথ চলছি। আমার সহপাঠী জলির স্বাস্থ্যটা ছিল একটু মোটা ধরনের। ফর্শা টকটকে। হঠাৎ আমার শরীরে মাখনের মতো নরম কিসের যেন স্পর্শ অনুভব করলাম। মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমকে গেল আমার শরীরে। এভাবে পথ চলতে চলতে জলি বাড়িতে পৌছে গেল। কিন্তু আমার বাড়ি যেতে আরো একটু পথ বাকি। বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ না থাকায় পাশেই একটা দোকানের নিচে দাড়ালাম।

কিছুক্ষণ পরে ছোট্ট একটি মেয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললো, ভাইয়া, আপনাকে আমার জলিআপু বাসায় ডাকছে। আপনি ভিজে যাচ্ছেন তো। তাই বাসায় গিয়ে বসতে বলছে।

আমি ছোট্ট মেয়েটির ছাতার মধ্যে তাদের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বৃষ্টির কারণে স্বভাবতই জলিদের বসার ঘরের জানালাগুলো সব বন্ধ ছিল।

জলি বললো, তুমি একদম ভিজে গিয়েছো দেখছি। শার্টটা খুলে ফেলো, তা না হলে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর আসবে।

শার্টটা খুলে ফেললাম।

জলি বললো, তোমার শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, গরম করে দিই। বলেই আমাকে জড়িয়ে ধরে খাটের ওপর শুয়ে পড়লো।

দ্বিতীয় দফায় আমার শরীরে আরেকবার বিদ্যুৎ চমকে গেল। ঝড় উঠলো আমার উদ্দীপ্ত যৌবনের প্রারম্ভিক স্তরে।

সেই বৃষ্টিমুখর দিনে আমার জীবনের প্রথম ঝড়ো হাওয়ার কথা আজো মনে পড়ে। স্কুল পেরিয়ে কলেজ, তারপরে ইউনিভার্সিটিতে এসেও ভুলতে পারিনি আমার জীবনের প্রথম নারী অনুভূতির কথা। এরপর থেকে আর কোনোদিন ছাতা না নিয়ে বাইরে যেতাম না। এখন ছাতা নিয়ে বের হওয়াটা যেন অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

খুলনা ইউনিভার্সিটি থেকে

কফি হাউস

– মৌফুরা মাহাবুবা রুমকি

ছোটবেলা থেকেই জেনে আসছি বর্ষাকালে স্যাতস্যাতে মাটিতে যে শাদা রঙের ছাতার মতো ছত্রাক জন্মায় তাদের *ব্যাঙের ছাতা* বলে। অবশ্য এখন পর্যন্ত কোনো ব্যাঙকে বর্ষাকালে এই ছাতর নিচে আশ্রয় নিতে দেখিনি।

সে যাই হোক। আজকাল বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, ফাস্ট ফুডের দোকানের সামনে এই ছাতা সদৃশ খড়ের বা লোহার তৈরি বিশাল আকৃতির ছাতা তৈরি করা হয়। লোকজনকে এই ছাতার নিচে বসে কোমল পানীয় বা কফি পান করতে দেখা যায় অথবা হটডগ বা বার্গারে কামড় বসাতে দেখা যায়। কিন্তু এ সকল ছাতাও যে শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধি ছাড়াও মানুষের বিপদের আশ্রয়স্থল হতে পারে তা আমার এই অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায়।

দিনটা ছিল আমার এইচএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন। কিছুটা ভয় আর হালকা আনন্দ মিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে বেশ সকালেই উঠলাম। পড়াগুলোতে শেষবারের মতো একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। সবাইকে সালাম করে রওনা দেবো ঠিক সেই মুহূর্তে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। দিন, না রাত ঠিক বোঝার উপায় নেই। অজানা আশঙ্কায় বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। প্রথম দিনই এমন অশুভ লক্ষণ।

আম্মু আর আমি দোয়া পড়ে রিকশায় উঠলাম। গন্তব্য রংপুর কলেজ। রিকশায় কিছুদূর যেতে না যেতেই শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি এবং প্রবল বেগে বইতে লাগলো ঝড়ো হাওয়া। এ সময় ছাতাটা সঙ্গে না নেয়ার কারণে নিজেকে আচ্ছা মতো বকাঝকা করে চলেছি। রিকশার সামান্য পর্দায় কোনো কাজ হচ্ছে না। আমি যাতে অন্তত না ভিজি সে কারণে আম্মু আমার দিকে পুরো পর্দাটাই দিয়ে দিলেন।

রিকশা যেদিকে চলছে তার উল্টোদিক থেকে বাতাস আসতে লাগলো। রিকশাচালক সর্বশক্তি দিয়েও সামনের দিকে রিকশা নিয়ে এগোতে পারছিল না। শেষে সে হাল ছেড়ে দিয়ে কোথাও থামতে চাইলো। থামার জন্য আশ্রয় খুজতে গিয়ে চোখে পড়লো রাস্তার ধারে কফি হাউসের সামনে বিশাল

আকৃতির খড়ের তৈরি তিনটি ছাতা। কফি হাউস তখনোও বন্ধ। সেই তিনটি ছাতার একটিতে তড়িঘড়ি করে ঢুকে পড়লাম, অন্যটিতে রিকশাচালক।

ছাতার নিচে বসে দুশ্চিন্তায় আমার মাথা ঘুরছিল। কারণ আমার পরীক্ষা শুরু হতে অল্প কয়েক মিনিট বাকি। কিছুক্ষণ পর বাতাস পুরোপুরি থেমে গেল। বৃষ্টিও কমে এলো। আমরা রওনা হলাম। প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াই শেষে পৌছালাম আরেক সংগ্রাম ক্ষেত্রে। পৌছে দেখি সবার খাতা দিয়ে দেয়া শেষ।

সেদিনের পরীক্ষাটা মোটামুটি ভালোই হয়েছিল। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে চোখে পড়লো কফি হাউসের সামনের সেই ছাতাগুলো এবং মনে মনে ভেবেছিলাম পরীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিন এই ছাতার নিচে বসে কফি খাবো। কফি খেয়েওছিলাম। তবে সেদিন ছিল না কোনো দুশ্চিন্তা। ছিল অফুরন্ত আনন্দ আর স্বস্তির নিঃশ্বাস।

স্টেশন রোড, রংপুর থেকে

বিকল্প

-- মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান মুনির

আমার নানাবাড়ি বরিশালের চাখার গ্রামে। আমার শৈশবের দুরন্ত সময়গুলো কেটেছে নানাবাড়িতে। এখন সেসব কথা মনে হলে খুব খারাপ লাগে। অনেক দিন হলো নানাবাড়ি যাওয়া হয় না। এক্ষেত্রে বলে নেয়া ভালো যে, আমার শ্বশুরবাড়িও চাখার। আমার বিয়ের আগে একবার চাখার গিয়েছিলাম। আমি এতোই ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাই যে, কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় হয়ে ওঠে না। সে বছর অনেক চিন্তা ভাবনা করে একটা তারিখ ঠিক করলাম এবং লঞ্চে বরিশাল যাত্রা শুরু করলাম। এমনিতেই দক্ষিণাঞ্চলে বর্ষাকাল শুরু না হতেই বৃষ্টি হয় ঘন ঘন সামুদ্রিক নিম্নচাপের কারণে। আর তখন ছিল ভরা বর্ষার মরসুম। চারদিকে পানি থৈ থৈ করছে। বড় বড় নদীগুলো যেন ভয়াবহ রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। একবার অবশ্য চিন্তা করেছিলাম এই বর্ষার মধ্যে গ্রামে গিয়ে ভালো লাগবে না। সারাদিন বাসায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে। কিন্তু বর্ষাকালে গ্রামীণ প্রকৃতির রূপ দেখার লোভ সংবরণ করতে না পেরে গ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি যখন নানাবাড়ি পৌছে গেছি তখন আকাশটা খুবই মেঘলা ছিল। চারদিকে কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর গুমোট ভাব বিরাজ করছিল। বিকেল নাগাদ অঝোর ধারায় বৃষ্টি শুরু হলো। কি বৃষ্টি! ঢাকায় বৃষ্টি এতো সুন্দর না। মনে হচ্ছে কে যেন টিনের চালে শত সহস্র ঘুঙুর বাজাচ্ছে।

সারা রাত বৃষ্টি হলো। সকালে ঘুম ভাঙার পর দেখি আকাশ পরিষ্কার। তাই ঘুরতে বের হলাম। পাকা রাস্তা ধরে হাটছি। অনেক দিন গ্রামে না আসায় অনেক কিছুই ভুলে গেছি। এরপরও খুব ভালো লাগছে। এই সময় হঠাৎ আকাশটা আবার গুড় গুড় করে উঠলো এবং কিছু বুঝে ওঠার আগেই অঝোরে বৃষ্টি শুরু হলো। কি করবো তখন। দাড়িয়ে দাড়িয়ে ভেজা ছাড়া কোনো উপায় নেই। হঠাৎ দেখলাম এক লোক কলাপাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছে। আমার মনেও চিন্তা এলো কলাপাতা মাথায় দিয়ে যাই। কিন্তু কলাপাতা যোগাড় করতে না পেরে রাস্তার ঢালুতে জন্মে থাকা বিশাল সাইজের কচুপাতা মাথায় দিয়েছিলাম। খুব মজা লাগছিল তখন অদ্ভুত ছাতাটার কথা ভেবে। বাড়ি পর্যন্ত সেই কচুপাতা মাথায় দিয়ে এসেছিলাম।

ঢাকা থেকে

জেদি

– প্রবীর কুমার পাল

শিউলি আর আমি একই কলেজে পড়তাম। তাছাড়া আমাদের বাড়িও একই এলাকায়। শিউলি ছিল আমার এক বছরের জুনিয়র। একই এলাকায় থাকতাম বলে কলেজে আসতে–যেতে প্রায়ই আমাদের দেখা হতো।

কিন্তু দুজনের কেউ–ই কারো সঙ্গে কথা বলতাম না। এর কারণটা ছিল, দুজনের ক্ষেত্র দুই রকমের। আমি ছিলাম একটু লাজুক প্রকৃতির এবং শিউলি ছিল কিছুটা অহঙ্কারী ও জেদি স্বভাবের।

এভাবে অনেক দিন চলে গিয়েছিল দুজন একই রাস্তা দিয়ে, একই এলাকা থেকে, একই সময়ে কলেজে যাচ্ছিলাম। অথচ কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছিলাম না। এরই মধ্যে বর্ষা চলে এলো। শিউলিদের প্রমোশন টেস্ট পরীক্ষা শুরু হলো। আমাদের তখন ফাইল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। তবুও কি কারণে যেন কলেজে গিয়েছিলাম। বর্ষাকাল বলে সঙ্গে ছাতা ছিল। কখন বৃষ্টি আসে তার তো ঠিক নেই! এ জন্য ছাতাটা নিয়েই বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম।

শিউলি পরীক্ষা দিয়ে বের হয়ে সবেমাত্র কলেজের গেটের সামনে এমন সময় বৃষ্টি নামতে শুরু করে। আমিও সেই সময় গেটের সামনে চলে এসেছিলাম। শিউলিকে পাশ কাটিয়ে গেটের বাইরে যাবো ঠিক তখনই আমার নাম ধরে ডাকলো, প্রবীরদা, বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান, আমি ছাতা আনিনি। তাছাড়া বৃষ্টিতে ভেজা আমার একেবারেই সহ্য হয় না।

তার কথা সে বলেই চলছিল। আমি কোনো উত্তর দিচ্ছিলাম না। শুধু ছাতাটা একটু তার দিকে কাত করে ধরেছিলাম মাত্র।

এরপর দীর্ঘক্ষণ এক সঙ্গে এক ছাতার নিচে। শিউলি একটা যুবতী মেয়ে, দেখতেও মন্দ না। তাছাড়া শারীরিক গঠনটাও বেশ। তার সঙ্গে এক ছাতার নিচে হাটতে বেশ ভালোই লাগছিল। তার শরীরের উষ্ণ স্পর্শ ও সুন্দর গন্ধ আমাকে মাতাল করে তুলছিল। হাটতে হাটতে বাড়ির কাছে চলে এলাম। এদিকে বৃষ্টিও থেমে গেছে। এক সঙ্গে হেটে আসতে আসতে তার এবং আমার মধ্যে অনেক কথা হয়েছিল।

এসব কথার ফাকে শিউলি আমাকে বলেছিল, প্রবীরদা, এতোদিন আপনার সঙ্গে কথা না বলে আমি কি যে ভুল করেছি! আসলে বুঝতেই পারিনি আপনি এতোটা ভালো। আজ থেকে সারা জীবন যেন এমনি করে আপনার পাশে পাশে থাকতে পারি সে প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে করি। এই বলে মিষ্টি হেসে সে চলে গিয়েছিল।

এভাবেই ছাতা আমার জীবনে নিয়ে এলো এক পশলা ভালোবাসার বৃষ্টি।

এ ছাতার কারণেই একটা সুন্দরী, অহঙ্কারী, জেদি মেয়ে আজ আমার প্রেমে পড়লো যে কি না কয়েকদিন আগেও দেখা হলে আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতো না।

জয়পাড়া, ঢাকা থেকে

ভুল

– এম ইসলাম

আমরা তখন রংপুর মেডিকাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। মেডিসিন ওয়ার্ড শেষে হসপিটাল থেকে এগারোটায় লেকচার ক্লাসের জন্য কলেজে যাবো বলে আমরা কয়েকজন হসপিটাল গেটে

অপেক্ষা করছি। এগারোটা বাজতে মাত্র মিনিট পাচেক বাকি। কিন্তু হসপিটাল থেকে বের হতে পারছিলাম না। কারণ বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। আমাদের মতোই বিভিন্ন ইয়ারের আরো অনেকেই গেটে এসে দাড়াচ্ছিল। আবার কেউ কেউ রিকশায় বা ছাতা মাথায় করে কলেজের দিকে যাচ্ছিল।

আমাদের মধ্যে মুকুট বরাবরই একটু লাজুক স্বভাবের হওয়ায় তাকে বিভিন্ন কারণে আমরা খেপাতাম। ছাতা মাথায় করে জুনিয়র এক মেয়েকে গেট থেকে যেতে দেখে মুকুটের সঙ্গে বাজি ধরলাম যে, মেয়েটির সঙ্গে কলেজ পর্যন্ত যেতে পারলে সে যা চায় তাই-ই দেবো। আমরা নিশ্চিত ছিলাম, অপরিচিত জুনিয়র মেয়েটির সঙ্গে কলেজ পর্যন্ত এই তিন চার মিনিটের রাস্তা সে যেতে পারবে না। কিন্তু আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে দিয়ে এক দৌড়ে মেয়েটির ছাতার নিচে সে পৌছালো এবং ছাতাটি তার হাতে নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে হাটতে লাগলো। পেছন থেকে আমরা দুইজন রিকশা নিয়ে কলেজে পৌছে দেখলাম স্টুডেন্ট সেকশনের সামনে তারা দুইজন দাড়িয়ে কথা বলছে। পরে মুকুটের কাছে জানতে চাইলে মেয়েটি সম্বন্ধে আমাদের একটা বৃফ দিল।

ঘটনা শুরু হলো কয়েকদিন পর। প্রতিদিন ওয়ার্ডে যাবার সময়, বের হওয়ার সময় অথবা কলেজে মেয়েটির সঙ্গে তার কিভাবে যেন একবার করে দেখা হয়েই যায়। বৃষ্টির দিনের কৃতজ্ঞতার খাতিরেই হোক বা অন্য কোনো দুর্বলতার জন্যই হোক, ভদ্রতাসূচক দুই একটা কথা মুকুটকে বলতেই হতো। ব্যাপারটা খোলাসা করার জন্য একদিন মুকুটকে মেয়েটির নাম ধরে বললাম, তোর সঙ্গে ইভা বিশেষ কিছু কথা বলতে চেয়েছে, তুই কি কথা বলবি?

প্রথমে ইতস্তত করলেও পরে সে রাজি হয়ে যায়।

একই কথা ইভাকে জানালে তারও সম্মতি লক্ষ্য করা গেল। এরপর দিন-তারিখ ঠিক করে কৌশলে দুইজনকে মুখোমুখি করালাম। ইভার সঙ্গে কথা বলে মুকুট বুঝে গিয়েছিল আমার কল্যাণেই আজ এতো দূর হয়েছে। কিন্তু ইভাকে বুঝতে দিইনি। হয়তো দূর থেকে আগেই তার প্রতি ভালোবাসার জন্ম নিয়েছিল। আসলে ভেবে-চিন্তে বা যাচাই-বাচাই করে কখনো প্রেম করা যায় না। প্রেম হঠাৎ হয়ে যায়। ঝড়ের বেগে দুইজনকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। ভাবার বা পেছনে তাকানোর ফুরসত পাওয়া যায় না। তাদের ভালোবাসা গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগলো।

একটি মানুষ যখন সব ভালোবাসা, আবেগ, অনুভূতি নিয়ে কেবল একটি নারীর কথা ভাবে তখন পৃথিবীর অন্যসব নারী তার কাছে মিথ্যা হয়ে যায়। ইভা তার বাবা-মাকে মুকুটের কথা জানিয়ে দিয়েছে। বাবা-মা মৌন সম্মতি দিয়ে দিয়েছে। এ কথাও আমরা সবাই জানলাম। মুকুটের সামনে শেষ বৃত্তিমূলক পরীক্ষা থাকায় সে তার বাসায় মেয়েটির কথা তখন বলতে পারেনি।

পরীক্ষা শেষে মুকুট গেল তার এক আন্টির কাছে যার কাছে সব ধরনের কথাই খোলাখুলিভাবে বলতে পারতো। মুকুটকে ছোটবেলা থেকেই আন্টি খুব বেশি আদর যত্ন করতেন এবং মুকুটের সমস্ত আবদার পূরণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। আন্টি খোজখবর নিয়ে উভয়পক্ষে কথাবার্তা বলবেন এমন আগ্রহে মুকুট অধীরভাবে যখন দিন কাটাচ্ছে তখন মেয়েটি সম্বন্ধে এমন এক সত্য প্রকাশিত হলো যা সবাইকে ক্ষতবিক্ষত করে দিল। মুকুটকে আন্টি শুধু জানালেন, তুই জীবনে মস্ত বড় একটা ভুল করেছিস। আন্টি পরে আমাকে ডেকে নিয়ে পুরো ঘটনা জানিয়েছিলেন।

এই মেয়েটি যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়ে তখনই সে তার বাবা মায়ের মাথা সমাজে হেট করে দেয়। কারণ তার এক সহপাঠীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল। আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুর সেই ঘটনার জন্য নিজেকে কেন যেন আজ পর্যন্ত অপরাধী বলে মনে হয়।

রংপুর মেডিকাল কলেজ থেকে

অবদান

-- আশিক

আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। কলেজে যাই ঠিকই কিন্তু ক্লাস করি না। আড্ডা দিয়েই ক্লাসের সময়টা পার করে দিতাম। রাজনীতি করতাম বলে কলেজের বিভিন্ন টাইপের বড় ভাই'দের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।

একদিন কলেজের গোল চত্বরে বসে সিগারেট ফুকছিলাম। সঙ্গে আমার বন্ধু মুন্না ছিল। দেখতে পেলাম আমাদের ক্লাসেরই এক মেয়েকে এক ছেলে কিছু বলতে চাচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটি ছেলেটির কথা শুনতে চাচ্ছিল না। বার বার ছেলেটিকে পাশ কাটিয়ে আসতে চাচ্ছিল। ছেলেটিও মেয়েটিকে আসতে দিচ্ছিল না, মেয়েটির পথ আগলে কথা বলতে চাচ্ছিল। হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে গেল। দৌড়ে গিয়ে ছেলেটিকে ধরে আচ্ছা মতো মারলাম এবং বললাম, ভবিষ্যতে যেন মেয়েদের সঙ্গে এ রকম না করে। ছেলেটি আমাকে তখন বললো, পরে আমার সঙ্গে তার আবার দেখা হবে। তখন আমাকে সে উচিত শিক্ষা দেবে।

আমার মেজাজ তখন আরো খারাপ হয়ে গেল। ছেলেটির পাছায় আরেকটি লাথি বসিয়ে বললাম, দেখা যাবে।

রোদ বা বৃষ্টিতে ছাতা ব্যবহার করার মতো ছেলে আমি না। ছাতা আমার কাছে বোঝা বলে মনে হয়। একদিন কলেজ থেকে আসার সময় পথে বড় ভাইয়ার সঙ্গে দেখা। আমাকে তার হাতের ছাতাটি দিয়ে বললেন এটা বাসায় নিয়ে আসতে। ছাতা হাতে বাসায় আসছি। হঠাৎ দেখলাম, কলেজে যে ছেলেটিকে পিটিয়েছিলাম সে ছেলেটি তার কয়েকজন বন্ধু নিয়ে আসছে। দূরে থাকায় তারা আমাকে চিনতে পারেনি। আশপাশে নিজেকে আড়াল করার মতো কোনো জায়গাও পেলাম না। ভাবলাম, আজ আর রক্ষা নেই। কোনো উপায় না দেখে হাতের ছাতা দিয়ে নিজেকে আড়াল করে এগোতে লাগলাম এবং মনে মনে আল্লাহর নাম নিচ্ছিলাম। তাদের কাছাকাছি আসতেই অন্যদিকে ফিরে প্রস্রাব করার ভঙ্গিতে বসে ছাতা দিয়ে নিজেকে আড়াল করে ফেললাম। তারা আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আমার হাতে সেদিন ছাতা থাকার কারণে এতো বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। ছাতার এই অবদান আমার ক্ষুদ্র জীবনে কখনো ভুলতে পারবো না।

সিলেট থেকে

সারা জীবন

– কথা

স্মৃতি, ছোট্টবেলার ছোট্ট স্মৃতি। কি সুন্দর তার নাম। বাবা মায়ের ভালোবাসায় জন্ম সুন্দর প্রাণের সুন্দর নাম। বাবার পরিকল্পিত নিজ ফলের নাম দেয়া কৃপা, কৃতী। ছোট্ট দুটি মেয়ে। মধ্যবিত্ত ছোট্ট

একটি পরিবারের দুটি ক্ষুদ্র সদস্য। তারা যখন হাটি হাটি পা পা করে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে তখন স্কুলের ব্যাগ, বই–এর মতো দুই বোনের ছিল হলুদ ও লাল রঙ–এর ছোট্ট দুটি ছাতা।

দুই বোনকে প্রতিদিন সকালে স্কুলে নিয়ে যান বাবা। কিন্তু বাড়ি ফিরি দুই বোন নিজেরাই। কেউ বাড়ি নিয়ে আসে না। ঠিক সেই রকম প্রতিদিনের মতো বাবা দুই বোনকে স্কুলে রেখে অফিসে গিয়েছেন। মাও অফিসে গিয়েছেন।

স্কুল ছুটির সময় অর্থাৎ ছুটির সেই ঢং ঢং শব্দ আর হঠাৎ নামা ঝমঝম বৃষ্টি ছোট্ট দুটি মনে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়। দুই বোন আনন্দে বাড়ি ফিরি আমাদের অতি পছন্দের দুটি ছাতা মাথায় দিয়ে। বাড়ি ফিরে দেখি মা তখনো বাড়ি ফেরেনি। মায়ের এ অনুপস্থিতি দেখে দুই বোন ছোট্ট বাড়ির ছোট্ট উঠানে বৃষ্টিতে স্নান করি। স্বরচিত ছড়ার তালে তালে নাচতে থাকি। বৃষ্টির সঙ্গে, ছাতার সঙ্গে খেলা করা এবং গান গাওয়া –

বৃষ্টি এলো সৃষ্টি হলো।
বৃষ্টির মধ্যে বেড়ানো ভালো।
ওস্তাদ থাকে ওই আকাশে।
ছাতার ওপর ঘুঘু ডাকে।

আর আমরা দুই বোন নাচি ও গান গাই।

আজ দুই বোন কতো বড় হয়ে গিয়েছি। ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। নেই সেই ছোট্ট উঠান, নেই সেই ছাতা দুটিও। কিন্তু ছাতার সেই স্মৃতি ও গান রয়ে যাবে সারা জীবন।

লালমাটিয়া থেকে

প্রতীক

– জান্নাতুল ফেরদৌস

১৯৭১ সাল। বেশ কিছুদিন হলো শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে আছি। বিভিন্ন শহর থেকে প্রায় সব আত্মীয়স্বজন বাড়িতে উঠেছে। আমি তখন ক্লাস সিক্সের ছাত্র। যুদ্ধ ভয় থাকলেও বেশ আনন্দ লাগছিল। স্কুল নেই, লেখাপড়া নেই, বিশেষ করে আমার কলেজ পড়ুয়া ছোটচাচার সান্নিধ্য পেয়ে। চাচার পায়ে সামান্য সমস্যা থাকার কারণে মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেনি বলে বেচারা সব সময় দুঃখ করতেন। সর্বক্ষণ তিনি স্বাধীনতার কথা শোনাতেন, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের* খবরাখবর বিস্তারিতভাবে আমার বয়সী ছেলেমেয়েদের মাঝে প্রকাশ করতেন। এ চাচার কাছে বাংলাদেশের ম্যাপ আকতে শিখেছি।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি। বর্ষাকাল। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। চাচা খুব সকালে নৌকা নিয়ে বের হয়েছেন বাজারে যাওয়ার জন্য। খালের মাথায় আসতেই ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি শুরু হলো। তিনি বৈঠা রেখে ছাতা খুলছিলেন ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে একটি ছোট লঞ্চে পাকবাহিনী আসছিল। ছাতাকে তারা রাইফেল আর চাচাকে মুক্তিবাহিনীর সদস্য ভেবে মেশিনগান দিয়ে ঝাঝরা করে তাকে। লঞ্চটি চলে যাওয়ার পর গ্রামের লোকজন চাচার মৃতদেহ আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসে।

রক্তাক্ত চাচার দেহ দেখে সবাই কান্নায় ভেঙে পড়ে। আমার দাদু একটুও কাদতে পারলেন না। রক্তাক্ত ছাতাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। সেদিন থেকে প্রায় ১৪ বছর দাদু বেচেছিলেন। দাদুকে প্রায়ই

দেখতাম, ছাতাটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন আর বিড় বিড় করে কি যেন বলতেন। এ হাত, সে হাত হয়ে কাপড় ও লোহার শিকগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাতার কাঠের বাটটি এখন আমার কাছে আছে। এ বাটটির দিকে চোখ পড়লেই দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নীরবে নিভৃতে চোখ বেয়ে দুই ফোটা পানি গড়িয়ে পড়ে।

আমার সন্তানেরা এখন ক্লাস সেভেন ও এইটের ছাত্রী। টিভি, রেডিও ও পত্রপত্রিকায় স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক কথা শোনে। সত্য কথা, মিথ্যা কথা সব কিছুকেই তারা সত্য ভেবে স্বাধীনতার ইতিহাসকে শ্রদ্ধা করে। নিজেরা স্বাধীনতা নিয়ে গল্প, কবিতাও লেখে। এতো গল্প, গান এবং বক্তৃতার মাঝে যখন তাদেরকে ছাতার এ বাটটি দেখিয়ে বলি, জানো, এ বাটটিই আমার কাছে *স্বাধীনতার প্রতীক।*

তারা ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

ব্যথা

– মোহাম্মদ জহিরুল হক সোহেল

ইসলামি শরিয়তে নারীদের জন্য পর্দা ফরজ করা হয়েছে। ইসলামি মাইন্ডের মহিলারা অনেকে সে জন্য বোরখা পরে। এছাড়া আরো অনেক কারণে কিছু মহিলা বোরখা পরে। যেমন পতিতা, অদ্ভুত মুখমণ্ডল, আগুন কিংবা এসিডে ঝলসানো মুখমণ্ডল ইত্যাদি। প্রখর রোদ নেই, বৃষ্টি নেই এমন দিনে পর্দার কারণে মেয়েদের ছাতার ব্যবহার আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়েছিল।

আমার পূর্বপুরুষদের বাড়ি মঠবাড়িয়ার একটি গ্রামে। একটা জরুরি কাজে আমার সেখানে যাওয়া তিন বছর আগে। আমি তখন এইচএসসি পরীক্ষার্থী। রাস্তার পাশে একটি চায়ের দোকানে চা খেয়ে একা রাস্তায় হাটছিলাম। তখন দেখি একটি গার্লস স্কুলের ছুটি হয়েছে। এ বয়সের ছেলেরা রাস্তায় পাশে দাড়িয়ে স্কুলের মেয়েদের চেহারা দেখার জন্য স্বাভাবিক উৎসুক হবেই। আমিও তার ব্যতিক্রম ছিলাম না।

আমি অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম, রাস্তা দিয়ে স্কুলড্রেস পরা যতো মেয়েরা যাচ্ছে তাদের সবার মাথার ওপর ছাতা। দূর থেকে যখন আসছে তখন দেখি ছাতার সামনের দিক উচু করে আমাকে দেখতে দেখতে আসে। কিন্তু যখন আমার সামনে দিয়ে যায় তখন মাথার সঙ্গে ছাতা ঠেকিয়ে নিয়ে যায়। একটি মেয়েরও চেহারা দেখা আমার হয় না।

রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। সরু রাস্তা, রাস্তার পাশে বেড়া দেয়া। আমার সামনে ছাতা মাথায় দিয়ে একটি মেয়ে আসছিল। হঠাৎ করে সামনের দিক থেকে একটি রিকশা আসে। রিকশা এবং মেয়েটি যখন আমাকে ক্রস করে যায় তখনই মেয়েটির ছাতার শিক এসে আমার এক চোখে আঘাত করে। প্রচণ্ড ব্যথা পাই।

মেয়েটি হতবাক হয়ে যায়। সে আমার ব্যথা পাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করে এবং সান্ত্বনার বাণী শোনায়। আমি এক চোখ রুমাল দিয়ে চেপে ধরে তার সঙ্গে কথা বলি। তাকে প্রশ্ন করি, তোমাদের স্কুলে ছাতা কি বাধ্যতামূলক?

উত্তরে বলে, না।

তবে কেন ছাতা মাথায় দিয়ে স্কুলে যাওয়া–আসা করো?

উত্তরে বলে, আমাদের গ্রামে প্রায় সব মেয়েরাই পর্দার জন্য ছাতা মাথায় দিয়ে স্কুলে আসা যাওয়া করে।

বলি, পর্দা যদি পালন করতেই হয় তাহলে এরপর থেকে বোরখা পরে স্কুল করবে।

জানতে পেরেছি, এরপর থেকে সে যতোদিন স্কুলে যেতো ততোদিন বোরখা পরেই যেতো। তার সঙ্গে আমার আরো অনেক কথা হয়। নাম তার রুমী। ক্লাস টেনে পড়ে। দেখতে সুন্দরী। রুমীকে ঠিকানা দিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য অনুরোধ জানাই।

সে কিছুদিন চিঠির মাধ্যমে আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। তারপর কিছুদিনের ভেতর তাকে জোর করে তার বাবা মা বিয়ে দিয়ে দেয়। রুমী স্বামীর ঘরে চলে যায় আমার সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু তার ছাতার কারণে আমার চোখের ব্যথা এবং মনের ব্যথা এখনো বয়ে বেড়াই।

পিরোজপুর থেকে